এক অসাধারণ কমিউনিস্ট নেতা

প্রকাশ কারাত

২০১২ সালের পয়লা মে থেকে পুতচালাপল্লী সুন্দরাইয়ার জন্ম শতবর্ষ উদযাপন শুরু হয়েছে। এ উপলক্ষে একজন অসাধারণ কমিউনিস্ট নেতার জীবন ও সংগ্রামের কথা আমরা স্মরণ করব। পি. সুন্দরাইয়া জনগণের কাছে পি এস নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি দু'দশকব্যাপী সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদবিরোধী সংগ্রামের ফসল। এই সংগ্রাম ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের দিকে নিয়ে যায়। মাত্র ১৭ বছর বয়সে সুন্দরাইয়া স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এ সময় থেকেই তাঁর রাজনৈতিক অভিযান শুরু হয়। যে অভিযান তিনি শুরু করেছিলেন একজন কংগ্রেস কর্মী হিসেবে, তার মধ্য দিয়েই তিনি পরবর্তীকালে একজন দৃঢ়মনা কমিউনিস্ট কর্মীতে রূপান্তরিত হন।

অন্যান্য অনেক স্বাধীনতা সংগ্রামী পরে কমিউনিস্ট হয়েছিলেন। তাঁদের মতোই সুন্দরাইয়া শুরু থেকেই জাতপাত প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। যুব বয়সে তাঁর রাজনৈতিক কর্মকান্ডের অন্যতম হচ্ছে, তাঁর গ্রামে দলিতদের বিরুদ্ধে জাতপাতের বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে তিনি অনশন সত্যাগ্রহ সংগঠিত করেন।

সুন্দরাইয়াকে কমিউনিস্ট পার্টিতে আনেন আমির হায়দর খান। আমির হায়দর খানই প্রথম কমিউনিস্ট যিনি প্রথম দক্ষিণ ভারত সফর করেন। সুন্দরাইয়া তখন ছাত্র। তাঁকে দেখে হায়দর খান বুঝেছিলেন এই ছেলেটির মধ্যে বিপ্লবী গুণাবলী রয়েছে। সেই থেকে সুন্দরাইয়ার উল্লেখযোগ্য বিপ্লবী কর্মকান্ড শুরু হয়। সুদূর অতীতের বিশ্লেষণে এটা পরিষ্কার যে ভারতে কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম ছিলেন পি. সুন্দরাইয়া। ১৯৩৬ সালে ২৪ বছর বয়সে তিনি কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। কেন্দ্রীয়ভাবে পুনর্গঠিত এটাই ছিল পার্টির প্রথম কেন্দ্রীয় কমিটি। দক্ষিণ ভারতে

পার্টি গড়ার দায়িত্ব তাঁকে দেওয়া হয়। ' কেরালার কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস' বইয়ে ই এম এস নাম্বুদিরিপাদ লিখেছেন — পি. সুন্দরাইয়া কেরালা ও অন্ধ্রপ্রদেশে প্রথম কমিউনিস্ট কর্মীদল গঠন করেন। পার্টি গড়ার কাজে সুন্দরাইয়া আত্মনিয়োগ করেন। জাতীয় আন্দোলনের মধ্যেকার পরিবর্তনপন্থী তরুণদের তিনি আকৃষ্ঠ করতে সক্ষম হন। তাঁর ক্লান্তিহীন কঠোর পরিশ্রমের সুবাদে অন্ধ্রপ্রদেশে কমিউনিস্ট আন্দোলনের ভিত্তি গড়ে ওঠে। তামিলনাড়ুর প্রথম কমিউনিস্ট গ্রুপের সঙ্গে সুন্দরাইয়ার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। সে সময় তামিলনাড়ু ও অন্ধ্রপ্রদেশের কিছু অংশ মাদ্রাজ প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

সি পি আই (এম) গঠনেও সুন্দরাইয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৬৪ সালে ৭ম পার্টি কংগ্রেসে সি পি আই (এম) গঠিত হয় এবং সুন্দরাইয়া সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন। তিনি ১২ বছর এই পদে থেকে গুরুদায়িত্ব পালন করে। তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করেছিলেন একটি মার্কসবাদী লেনিনবাদী পার্টি গড়ে তোলার কাজে। ১৯৬৭ সালে 'পার্টি সংগঠন গড়ার ক্ষেত্রে আমাদের কর্তব্য' শীর্ষক একটি দলিল কেন্দ্রীয় কমিটিতে গৃহীত হয়। এই দলিল তৈরির ক্ষেত্রে তাঁর যথেষ্ট অবদান ছিল। ভারতে বিপ্লবী সংগঠন গঠনের এটা ছিল প্রাথমিক পরিকল্পনা।

কৃষি বিপ্লবের রণনীতি তৈরিতে পি. সুন্দররাইয়া প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন। ১৯৩৬ সালে সারা ভারত কৃষকসভা গঠিত হয়। সুন্দরাইয়া তার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা - সদস্য ছিলেন। যুগ্ম সম্পাদক পদে তিনি নির্বাচিত হন। কৃষি শ্রমিকদের সংগঠিত করা এবং গ্রামীণ পলেতারিয়েত হিসেবে তাদের ভূমিকার ওপর প্রথম যাঁরা গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন, সুন্দরাইয়া ছিলেন তাঁদের অন্যতম। তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত তেলেঙ্গানার সশস্ত্র কৃষক বিদ্রোহ অবিস্মরণীয়। তাঁর লেখা ' তেলেঙ্গানা জনযুদ্ধ ও তার শিক্ষা' বইয়ে এই ঐতিহাসিক সংগ্রামের সুসংহত বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পরবর্তীকালে তিনি কৃষি সমস্যার বিভিন্ন দিক ও গ্রামীণ ক্ষেত্রে বিকাশমান শ্রেণিগুলির পর্যবেক্ষণে মনোযোগী হন। ৭০ এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে অন্ধ্রপ্রদেশের বিভিন্ন গ্রামে তিনি সমীক্ষা চালান এবং ভূমি সমস্যা বোঝাপড়ায় পৌঁছেন। তাঁর দৃঢ়

বিশ্বাস ছিল যে কৃষি শ্রমিক ও গরীব কৃষকদের মুক্ত করতে পারে কৃষি বিপ্লব এবং কৃষি বিপ্লব ছাড়া ভারতে গণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাধা হতে পারে না।

পি. এস ছিলেন মার্কসবাদী- লেনিনবাদী মতাদর্শ ও নীতিমালার সুদৃঢ় রক্ষক। কমিউনিস্ট আন্দোলনের মধ্যে শোধনবাদী প্রবণতার বিরুদ্ধে যেমন তিনি লড়াই করেছেন, তেমনি সমভাবে লড়েছেন 'অতিবাম' বিচ্যুতির বিরুদ্ধেও। যে মানুষটি তেলেঙ্গানা কৃষকদের গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন তাঁর পক্ষে নকশাল আন্দোলনের বামবিচ্যুতি ও পেটিবুর্জোয়াসুলভ বিপ্লবীয়ানা উন্মোচিত করা সহজতর ছিল।

সুন্দরাইয়ার আরেকটি মহৎ গুণ ছিল, তিনি পার্টি ও গণআন্দোলনের কর্মীদের পরিপুষ্ট করা ও তাদের মানোন্নয়নে ভূমিকা নিতেন। বিভিন্ন সময়ে নেতৃত্বের বিভিন্ন জায়গায় থেকে তাঁকে কাজ করতে হয়েছে। কিন্তু সম্ভাবনাময় কর্মীদের চিহ্নিত করতে, তাদের দক্ষতা নিরূপণ করতে তিনি সবসময় সচেষ্ট থাকতেন বেং তাদের পার্টিতে এনে রাজনৈতিক- সাংগঠনিক-মতাদর্শগত চেতনার বিকাশ ঘটিয়ে তাদের দক্ষতা বাড়ানোর প্রতি নজর রাখতেন। সুন্দরাইয়ার এই বিশেষ গুণ পরবর্তী বিভিন্ন প্রজন্মের কমিউনিস্ট কর্মীদের আত্মবিকাশে উৎসাহিত করেছে।

পি এস এর প্রজন্মের বহু কমিউনিস্ট নেতা ছিলেন আত্মোৎসর্গ পরায়ণ এবং নিবেদিত প্রাণ। তবে, সহজ-সরল জীবনযাত্রা, নিজেকে উৎসর্গ করার মানসিকতা এবং পার্টি ও বিপ্লবী মতাদর্শের প্রতি অবিচল থাকার ক্ষেত্রে সুন্দরাইয়া ছিলেন তাঁর সমকালীন নেতৃত্বের মধ্যে শীর্ষস্থানে। অন্ধ্রপ্রদেশের গ্রামীণ এলাকায় সুন্দরাইয়া মাইলের পর মাইল সাইকেল চালিয়েছেন। দিনের পর দিন তেলেঙ্গানার গভীর জঙ্গল অতিক্রম করেছেন। এবং বছরের পর বছর জেলে থাকা অবস্থায়ও শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন অতিবাহিত করেছেন। পার্টির জন্য তাঁর নিঃস্বার্থ অবস্থান অন্যদের এ গুণের অধিকারী হতে উদ্বুদ্ধ করেছে। এই যে তাঁর সাধারণ জীবনযাপন ও আত্মত্যাগ, তা দেখে অন্ধ্রের অনেক অকমিউনিস্ট ব্যক্তি তাঁকে 'কমিউনিস্ট ঋষি' বলে

আখ্যায়িত করতেন।

২০ তম পার্টি কংগ্রেস বছরব্যাপী নানা কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে সুন্দরাইয়ার জন্মশতবর্ষ পালনের আহ্বান জানিয়েছে। পার্টি গঠন ও তাকে শক্তিশালী করার কাজে বছরটিকে বিশেষভাবে কাজে লাগাতে হবে।

ঘরে ফেরা ও আমার গ্রামে আমার কাজকর্ম

পি. সুন্দরাইয়া

আমাদের গ্রামের বাড়ি আলাগনিপড়ুতে (Alagonipadu) আমি পাঁচ মাস ছিলাম, ঐ সময় আমি পারিবারিক বিষয় সম্পত্তি ইত্যাদি নিষ্পত্তি করে সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক কাজে যুক্ত হতে চাইছিলাম। ঐ সময়ে একটার পর একটা ঘটনা ঘটছিল। খবরের কাগজ পড়ে জানতে পারলাম আমির হায়দার খান, ভি. কে নরসীমাসহ সকল অগ্রণী কমরেডগণ গ্রেপ্তার হয়েছেন। তাঁদের বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্রের মামলা রুজু হয়েছিলো এবং তার তদন্ত চলছিলো। তাই মাদ্রাজ ফিরে গিয়ে অন্য সঙ্গীসাথীদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করা সমীচীন মনে হলো না। যদিও গোপনে কমিউনিস্ট আন্দোলনে অংশগ্রহণের ব্যাপারে সিদ্ধান্তে আমি অটল ছিলাম। কিন্তু ভাবলাম জেলখানাতে গিয়ে আমির হায়দার খানের সঙ্গে দেখা করলে অযথা পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষিত হবে, এরা আমার গতিবিধির উপর নজর রাখতে শুরু করবে।

ইতোমধ্যে লন্ডন গোল টেবিল বৈঠক ব্যর্থ হওয়াতে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন নতুন একটি মাত্রা পায়। শূন্য হাতে ফিরে এসে গান্ধীজি আবার নতুন করে আন্দোলনের ডাক দিলেন। সে সময় আমি আরো কয়েকজন যুবককে নিয়ে গ্রামের গরিব কৃষক এবং খেতমজুরদের কয়েকটি দাবিকে গুরুত্ব দিয়ে আন্দোলন সংগঠিত করতে শুরু করি। আমার মনে হয়েছিলো এই যুবকদের মাধ্যমে সাংগঠনিক কাজকর্ম চালানো যেতে পারে। বিপ্লবী আদর্শকে পাথেয় করেই আমার জীবন অতিবাহিত করবো এই ছিলো আমার সিদ্ধান্ত। তাই আমার নিজের জমিজমা বা ব্যক্তিগত সম্পত্তি রাখার কোন অর্থ আছে বলে আমার মনে হলো না।

সেমতই ১৯৩২ এর মধ্যে আমি এই সমস্ত বিষয় সম্পত্তির একটা

নিষ্পত্তি করে ফেলি। আমার বড়ো ভাইকে বললাম, তিনি আমাকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন, তাঁর সন্তান আছে, পরিবার আছে, যাদের প্রতিপালন করার দায়িত্ব তাঁর, তাই আমার অংশের জমিজমা ও সম্পত্তি সমস্তই তিনি নিয়ে নিতে পারেন। 'আমার জীবন আমি রাজনীতির জন্যই উৎসর্গ করবো— এই ছিলো আমার সংকল্প; তাই এই বিষয় সম্পত্তি আমার কোন কাজে আসবে না' ইত্যাদি বলে আমি তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করি। রাম ও তিনি, দুজনে আমার সম্পত্তি সমানভাগে ভাগ করে নিয়ে নিতে তাঁকে অনুরোধ করি। বিনিময়ে আমার রাজনৈতিক ক্রিয়াকান্ড চালাবার জন্য কিছু টাকা বা এলাউন্স দিলেই চলবে। সম্পত্তির বেশির ভাগ অংশ আমি তাঁকে নেবার জন্য জোর করতে থাকি, কারণ সমস্ত পরিবারের দেখভাল তিনিই করতেন। তাঁর আরো অনেক দায়িত্ব ছিলো। আমার বৌদি তখন সন্তানসম্ভবা ছিলেন। ১৯২৭ থেকেই তিনি এসংক্রান্ত নানা রোগে ভুগছিলেন। আমাকে তাঁর খেয়াল রাখতে হতো, যত্ন নিতে হতো। তাঁর ঔষধপত্র কেনা, চিকিৎসার জন্য মাঝে মাঝে নেল্লোর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি আমাকে করতে হতো। সেসময় সব কিছুর জন্য আমাদের নেল্লোরের উপর নির্ভর করতে হতো। এমন কি প্রস্রাব পরীক্ষার জন্য পর্যন্ত ১৬ মাইল দূরের শহর নেল্লোরে যেতে হতো। আমাদের পরিবারটি জমিদার পরিবার ছিলো বলা যেতে পারে। সেদিক থেকে ধরতে গেলে যথেষ্ট অবস্থাপন্ন পরিবার, কিন্তু টাকা খরচ করে কিছু করা আমাদের পক্ষে সব সময়ই অসুবিধাজনক ছিলো। তাই সাধারণত: আমি একটা সাইকেলে চেপে নেল্লোর থেকে বৌদির জন্য ওষুধ বা ফলটল কিনে আনতাম। এসব কারণে তাঁর সঙ্গে আমার একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিলো। যতদূর মনে পড়ে সে সময় তাঁর একটা ছোট্ট মেয়েও হয়েছিলো, নাম ছিলো বিদ্যুল্লতা। সম্প্রতি সে মারা গেছে। পরে আমার বৌদির আরেকটি সন্তান হয়েছিলো।

প্রথমদিকে দাদা কিছুতেই আমার প্রস্তাবে রাজি হচ্ছিলেন না। তিনি বললেন তাঁর নিজের সম্পত্তি আছে, সুতরাং আমার অংশ আমারই থাকা

ঠিক হবে। প্রায় ১৩ একরের মত জমি ও একটি বাড়ি আমার ভাগে পড়েছিলো। শেষপর্যন্ত ৬.৫ একর জমি, একটি খালি বাড়ি ও বাকি জমির মূল্যবাবদ ২,০০০ টাকা দিতে আমি তাঁকে রাজি করাতে সমর্থ হই। আমি এই বাড়িটাকে সাংগঠনিক কাজ চালাবার জন্য একই সঙ্গে লাইব্রেরি, স্কুল বাড়ি ও অফিসবাড়ি বানিয়ে ফেললাম। তীব্র অর্থনৈতিক মন্দা চলছিল তখন। জমি ও কৃষিজ পণ্যের দাম ছিলো অত্যন্ত কম। এক একর জমির দাম ছিলো ৩০০ থেকে ৪০০ টাকা। আর এক বস্তা চাল বিক্রি হতো মাত্র ২ টাকা ৫০ পয়সাতে। তাই অর্থের সংস্থান করা খুবই কঠিন ছিলো। আমার মাও তাঁর অংশ হিসাবে ১৩ একর জমি পেয়েছিলেন। আমি নিজে কখনো চাষ করবো না তাই আমার অংশের জমিটা দাদাকে কিনে নিতে অনুরোধ করি। আর বাকি জমিজায়গা রামের সঙ্গে ভাগ করে নিতে বলি। এভাবে আমি আরো তিন হাজার টাকা পাই। বাইরের অন্য কারো কাছে জমিটা বিক্রি করার চাইতে আমার দাদার হাতে তুলে দেওয়াই ঠিক হবে বলে আমার মনে হয়েছিলো। আমার এই সিদ্ধান্তের আরেকটি বড় কারণ ছিলো, সে সময় যারা জমিদার বা জোতদার ছিলেন, তাদের মধ্যে একমাত্র আমার দাদাই নিজের জমিতে নিজে চাষ করতেন।

আমার এ সিদ্ধান্তের জন্য পরে আমাকে অনেক কড়া কথা শুনতে হয়েছিলো। কিছু লোক বলতে লাগলো, " সুন্দরাইয়া তার নিজের ভাই এর কাছে জমি বিক্রি করার মধ্যে একটা বিরাট ব্যবসায়িক লেনদেনের ব্যাপার আছে। কেউ বা বললো, " কোথায় গেল কমিউনিস্টের নীতি আদর্শ— গরিবদের মধ্যে জমি বিলি করে দেবার নীতির কি হলো?' ইত্যাদি ইত্যাদি। এ সমস্ত বিতর্কের জবাবে আমি বলতাম, " গরিবদের জমি দেবার আমি কে? তাদের এজন্য লড়াই করতে হবে এবং সংগ্রাম করেই তাদের এই অধিকারকে আদায় করতে হবে।' আমার দাদা দীর্ঘকাল ধরেই জমিজামা দেখাশুনা করে আসছেন, বস্তুত: পক্ষে তিনিই এই কৃষিফার্মের পরিচালক, এবং ভবিষ্যতেও তিনি তাই করবেন। সেদিক থেকে দেখলে পরে সম্পত্তির ভাগাভাগি নিয়েও কোন সমস্যা হবে না। তাই দাদার হাতে জমি সম্পত্তি

তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত সঠিক ছিলো। তৃতীয়বার অপারেশনের পর ১৯৪৮ এর কোন একটা সময়ে আমার দাদার মৃত্যু হয়। তাঁর পেপ্‌টিক আলসার হয়েছিলো এবং আরো নানা সমস্যা ছিলো। তাই যখন ভাগ বাটোয়ারার বিষয়টি নিষ্পত্তি হয়ে গেলো, তখন আমার অনেক আত্মীয় পরিজন বন্ধুবান্ধবেরা বললো, দাদার হাতে সমস্ত সম্পত্তি এভাবে তুলে দেওয়াটা বোকামি হয়েছে, এই জমির বিনিময়ে আমার আরো অনেক বেশি টাকা পাওয়ার কথা ছিলো ইত্যাদি। আমি তাঁদের বলেছিলাম, আসলে ঘটনাটা তারা যেমন বলছেন তেমন নয়। প্রকৃতপক্ষে ছাত্রজীবন থেকেই আমার বড়ভাই যখনই আমি তাঁর কাছে কোন টাকা চেয়েছি তখনই তিনি তা দিয়েছেন কখনো না করেননি। এবং আমার জমি হস্তান্তরের জন্য আমাকে তিনি ৬ হাজার টাকা দিয়েছিলেন। প্রথমে যে মূল্য ধার্য হয়েছিলো পরে তার দ্বিগুণ অর্থ তিনি আমাকে দিয়েছিলেন। আমি যখনই তাঁর কাছে কোন টাকা চেয়েছি, তা দু'হাজার পাঁচ হাজার যাই হোক না কেন বিনা বাক্যব্যয়ে তিনি তা দিয়েছেন, কখনো জানতেও চাননি ঐ টাকা দিয়ে কি করবো বা কিছু। এক কথায় তিনি আমার কাজকর্মের জন্য আমাকে অনেক টাকা দিয়েছিলেন। আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের আমি বলেছিলাম প্রশ্নটা টাকা পয়সার নয়, আমাদের কাছে বড় ছিলো আমাদের পারিবারিক হৃদ্যতা, সম্প্রীতি আর ভালোবাসা।

সে সময় সমাজের মধ্যে যে অবাধ বৈষম্য ছিলো তার কিছু কিছু ঘটনা আমার এখনো মনে পড়ে। আমাদের খামারের কৃষকদের সঙ্গে আমি তখন মাঠে কাজ করতাম। আমার মা খামারের সকল শ্রমিকদের জন্যই খাবার পাঠাতেন, কিন্তু আমার জন্য যে খাবারটা পাঠাতেন তা তিনি আলাদা করে রান্না করতেন। আমি তাঁকে বারবার বলতাম সবার জন্য যে খাবার পাঠানো হয় আমার জন্যও সেই একই খাবার পাঠাতে। শেষে আমি মাকে বলি তিনি যদি তা না করে আমার জন্য বিশেষভাবে রান্না করা খাবার পাঠান তবে আমি আর খাবোই না। আমার পীড়াপাড়িতে কিছুটা পরিবর্তন হয়েছিলো

বটে, তবে তা খুব উল্লেখযোগ্য নয়। স্বাভাবিকভাবেই আমার জন্য যে যত্ন নিয়ে তিনি খাবার বানাতেন, শ্রমিকদের জন্য তিনি সেরকম খাবার বানতেন না, সে খাবারের গুণমানও তত ভালো ছিলো না।

খুব দ্রুত আমি খামারে কাজ করার জন্য যে দক্ষতা দরকার তা আয়ত্ত করে ফেলি। আমাকে এত কঠোর পরিশ্রম করতে দেখে খামারের কৃষকরা বলতো আমি নাকি একদম আমার বাবার মত দক্ষ হয়ে উঠেছি। আমি তাদের বলতাম এসব কাজ আমার কাছে তেমন কোন কঠিন মনে হয় না। আমার কাছে সবচেয়ে কষ্টকর মনে হতো অনেকক্ষণ ধরে কোমর নুইয়ে ফসল কাটা। অত্যন্ত কষ্টদায়ক হলেও ফসল কাটার কাজ কিন্তু আমি ছাড়িনি। সে সময় আর পিচাইয়া বলে আমাদের একজন ভৃত্য ছিলো, প্রধান ভৃত্য। অনেক পুরনো লোক, তিনি আমার বাবার সময় থেকেই কাজ করতেন; আসলে তিনি আমাদের খামারে কাজ করতেন আমার জন্মের আগে থেকেই। পিচাইয়া আমাকে খুব স্নেহ করতেন। একদিন আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম এই শ্রমিকরা সারা দিন ধরে ফসল কাটে অথচ ওরা তো একবারও বলে না যে ওদের পিঠে ব্যথা হচ্ছে? দিনে কয়েকঘণ্টা ফসল কাটলেই তো আমার পিঠে অসম্ভব ব্যথা শুরু হয়ে যায়। তিনি বললেন যে আমি তো সদ্য সদ্য এই কাজে এসেছি তাই আমি ব্যথাটা চেপে রাখতে পারছি না। এরকম দুর্বিষহ ব্যথা সব শ্রমিকেরই হয়, কিন্তু তবু এরা কাজ করে চলে কারণ এই কাজ করেই এরা এদের সংসারের সকলের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করে। ফসল কাটার কাজে আমি ৪ থেকে ৬ ঘন্টা পর্যন্ত ধৈর্য রাখতে পারতাম। ব্যথা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য আমি শ্রমিকদের জন্য বাড়ি থেকে খাবার নিয়ে আসার অনুমতি চাইতাম। ফসলকাটার মরসুমে কমপক্ষে ৩০ থেকে ৪০ জন শ্রমিক খামারে কাজ করতো। স্বাভাবিকভাবেই ওরা আমাকে এত খাবার মাথায় করে নিয়ে আসা থেকে নিবৃত্ত করতে চাইতো। আর আমার কাছে মনে হতো খাবার নিয়ে আসার সময়টা অন্তত: ফসল কাটতে পিঠে যে তীব্র ব্যথা হয় তার থেকে কিছুটা রেহাই পাবো। তাই যেভাবেই হোক জোরাজুরি করে

আমি খাবার আনতে বাড়ি যেতাম। এটা সত্য যে এত বিপুল পরিমাণ খাবার বয়ে নিয়ে আসাটা কোন সহজ কাজ ছিলো না, বিশেষ করে যারা এ কাজ করতে অভ্যস্ত নয় তাদের পক্ষেতো খুবই কঠিন। কিন্তু ফসল কাটার চেয়ে এই ভার বহন অনেক সহজ মনে হতো আমার।

পিঠে ব্যথার এই সমস্যাটা চারা তুলে খেতে রোপনের সময়ও হতো। ভেজা নরম মাটির মধ্যে চারা রোপন করা এমন কোন কঠিন কাজ নয়। কিন্তু চারা লাগাবার জন্য ঘন্টার পর ঘন্টা কোমর নুইয়ে কাজ করতে হতো। এটাও আমার পক্ষে খুব কষ্টকর কাজ ছিলো। এই ব্যথার হাত থেকে বাঁচার জন্য চারার গোছাগুলি বান্ডিল করে মাঠের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে নিয়ে যাবার দায়িত্ব নিতাম। এই চারার বান্ডিলগুলোর ওজন হতো ২০ থেকে ২৫ কেজি, তবু ভেজা নরম মাঠের মধ্য দিয়ে এগুলো বয়ে নিয়ে যাওয়া আমার কাছে অনেক সহজ মনে হতো। আসলে এই সময়ের মধ্যে আমি কাধে কিংবা মাথায় করে বোঝা বয়ে নিয়ে যেতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম। ছাত্র জীবন থেকে শুরু করে ১৯৩১- ৩২ সালে যে চার পাঁচ মাস আমি গ্রামে ছিলাম সে সময়ের কাজের অভিজ্ঞতা পরবর্তী সময়ে এই গরিব কৃষি শ্রমিক, খেতমজুরদের দাবি-সনদ প্রস্তুত করতে আমাকে খুবই সাহায্য করেছিলো।

গ্রামে আমাদের পারিবারিক জমিজিরেতের বিষয়গুলি একটা সমাধান করে ফেললেও সেই মুহূর্তেই মাদ্রাজে ফিরে গিয়ে গুপ্ত আন্দোলন সংগঠিত করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিলো না। ইতোমধ্যে আমির হায়দার খান গ্রেপ্তার হয়েছিলেন এবং তাঁর যাবজ্জীবন কারাদন্ড হয়েছিলো। তাই মাদ্রাজ ও বোম্বের কমরেডদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন না হওয়া পর্যন্ত আমি আলগানপডুতেই থেকে যেতে বাধ্য হলাম। এই অন্তর্বর্তী সময়টাতে আমি গ্রামে একটা ন্যায্যমূল্যের দোকান চালাতে শুরু করলাম।

এছাড়া আরো নানা কাজ সেসময় করেছিলাম। এসব কথায় পরে আসছি। যখন খামারে কাজ করতাম তখন ফার্মের শ্রমিকরা জীবনের অনেক

কথা আমার কাছে বর্ণনা করেছিলো। তারা আমায় শুনিয়েছিলো কিভাবে জমিদার ও ধনী কৃষকরা তাদের বঞ্চনা করে বা ঠকায়। তারা আমাকে বলেছিলো কিভাবে এই জমিদাররা শ্রমিকের ঘরের মহিলাদের উৎপীড়ন করতো। এবং অবশ্যই এই জমিদাররা নিজেদের ঘরের মহিলাদের বা অন্য মহিলাদেরও কিভাবে শোষণ অত্যাচার করতো। তারা পরিবারের মহিলাদের সঙ্গে তাদের যৌন সম্পর্কের কথা গর্বের সঙ্গে বলে বেড়াত। এটা যে শুধু জমিদাররা করতো এমন নয়, শ্রমিকরাও একই রকম ব্যবহার করতো। গ্রামে কিংবা আমার বোনের বাড়িতে যাবার সময় শ্রমিকদের আলোচনা শুনে এটা আমি বুঝতে পেরেছিলাম। সে সময় আমি বিভিন্ন গ্রামে ঘুরে বেড়িয়েছি, আর বেড়াবার সময় সাধারণত অনেক শ্রমিক আমার সঙ্গী হতো।

এই সমস্ত অভিজ্ঞতা থেকে এটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিলো যে এই মহিলারা নিজের ইচ্ছায় জমিদারের কাছে গিয়ে থাকুক বা জমিদার এদের জোর করে বাধ্য করে রাখুক—যাই হোক না কেন এটা সমাজের সুস্থ চিত্র নয়, এটা উচ্ছৃঙ্খলতার লক্ষণ। একে পুরোপুরি মুছে ফেলা সম্ভব না হলেও এই অবস্থার পরিবর্তন খুবই জরুরি। শ্রমিকদের এসব আলোচনা আমার শুনতে ভালো লাগতো না সত্য, তবু ওদের কথা বলতে দিতাম, যাতে মন খুলে ওদের অনুভূতির কথা জানাতে পারে। ওদের প্রতি আমি খুবই সহানুভূতিশীল ছিলাম। সাধারণত: জমিদার পরিবারের কিশোর ও যুবকেরা খুব উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন করতো। আমি তাদের মত ছিলাম না। কিন্তু তাদের কথাবার্তা থেকে এটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিলো যে এদের ব্যক্তিজীবনে যৌনতা বিষয়টিই ছিলো সবচেয়ে বড় ব্যাপার। একজন নারী ও একজন পুরুষ যদি পরস্পরের সহমতে স্বেচ্ছায় এরকম সম্পর্ক গড়ে তোলে, এমনকি এ সিদ্ধান্ত যদি শেষ পর্যন্ত ভুল বলে প্রমাণিত হয় তবু এটা তেমন গুরুতর কোন বিষয় নয় বা তেমন সাংঘাতিক কেচ্ছাকেলেঙ্কারির ব্যাপার নয়। কিন্তু যদি কোন পুরুষ কোন মহিলাকে বলপূর্বক বাধ্য করে একাজে প্রবৃত্ত করে তবে সেটা খুবই অনৈতিক। এধরনের কাজকে আমি ঘৃণা করি। নারীদের উপর এই যৌন শোষণ, যে অশেষ অত্যাচার উৎপীড়ন

তাদের সহ্য করতে হতো তা দেখে নারীদের সমানাধিকার ও নারীমুক্তির দর্শনের প্রতি আমার বিশ্বাস আস্থা আরো সুদৃঢ় হয়। ইতোমধ্যে আমি আমাদের দেশের অনেক মহীয়সী নারীর জীবনচরিত পড়ে ফেলেছি, তাঁদের সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পেরেছি। এমনকি বন্দারু অচ্চামাম্বার 'অবলা সুচরিত্র রত্নমালা' ও আমার পড়া হয়ে গেছে, সম্ভবত: এই বইটি এখন আর পাওয়া যায় না। এই সমস্ত গ্রন্থের প্রকাশক ছিলো বিজ্ঞান চন্দ্রিকামন্ডলী। বন্দারু অচ্চামাম্বা ছিলেন কামাররাজু লক্ষ্মণ রাও-এর বোন। নবজাগরণের চিন্তাচেতনায় পরিপুষ্ট পরিবারগুলির মধ্যে অন্যতম একটি পরিবার ছিল এই পরিবারটি। সমাজে তাঁদের পরিবারের প্রভাবও ছিল অপরিসীম। বস্তুত: লক্ষণ রাও-ই সর্বপ্রথম বিজ্ঞান ও ইতিহাসের সমস্ত বই তেলেগু ভাষায় প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৩৫/৩৬ সালের মধ্যে বিবাহ এবং নৈতিকতা বিষয়ক প্রচুর বই আমি পড়ে ফেলি। সনতারিখ ঠিক মনে নেই তবে ১৯৪৭ এর আগেই আমি বার্টান্ড রাসেলের বই এর সঙ্গেও পরিচিত হই। এলউইন কয় নামের একজন সুইস লেখক বিবাহের নৈতিকতা সম্বন্ধে একটি বই লেখেন। ঐ বইটিও আমি পড়েছিলাম। এই সমস্ত গ্রন্থ অধ্যয়ন ও চর্চার মধ্য দিয়ে আমি লিঙ্গ সমতা এবং নারীর সমানাধিকারের এক প্রবল সমর্থক হয়ে উঠি।

১৯৩২ সালে আমির হায়দার খান, ভি কে নরসীমা এবং রাজা ভাদীভেলুকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে অন্তরীণ করে রাখা হয়, তখন আমার কি করা ঠিক হবে আমি গভীরভাবে চিন্তা করি। অবশেষে আমি স্থির করি আপাতত আমি গ্রামে থেকেই নানা ধরনের কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখবো এবং মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির বিভিন্নস্থানে আমার যেসব পুরনো সহকর্মী-বন্ধুরা আছেন তাদের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তুলবো। তাদের সাথে যোগাযোগ স্থাপিত হলে গুপ্ত আন্দোলনকে প্রসারিত করে, বিশাল আকার দেওয়ার কাজ অনেক সহজ হবে। গ্রামে কমিউনিস্ট আন্দোলন গড়ে তোলার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে আমি গ্রামের সাধারণ মানুষের জন্য একটি লাইব্রেরী চালু করি এবং শিশুদের জন্য বিশেষ করে কৃষিশ্রমিক ও দুর্বল অংশের পরিবারের

শিশুদের জন্য একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করি। তখন গ্রামের প্রধানস্থলে এরকম নিম্নবর্গের পরিবারের ছেলেমেয়েদের পড়াশুনা করার অধিকার ছিলো না। সেখানকার পঠনপাঠনের মানও ভালো ছিলো না। সেই সময় ব্যবসায়ীরা নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের জন্য অনেক বাড়তি দাম নিতো। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের চড়াদামের বিরুদ্ধে সর্বত্রই অভিযোগ ছিলো, বিশেষ করে শ্রমিকদের তরফ থেকে এই অত্যধিক মূল্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিলো। আমি সমস্ত ভোক্তাদের একত্রিত করে একটি সমবায় বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করি। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই এই গরিব কৃষক ও খেতমজুরদের একটি প্রগতিশীল আন্দোলনে শামিল করতে সমর্থ হই।

সমবায় বিক্রয় কেন্দ্রটি গ্রামীণ সাধারণ মানুষের মধ্যে বিরাট সাড়া জাগিয়ে তোলে। আমি যতদিন সেখানে ছিলাম দোকানে প্রচুর লাভ হচ্ছিলো। আমরা সবকিছু বিক্রি করতাম এই দোকানে—পেয়াঁজ, রসুন, হলুদ, মরিচ, চিনি, গুড়, লবনসহ মুদি দোকানের সব জিনিস । স্থানীয়ভাবে এসব কিছুই পাওয়া যেতো না। নেল্লোর থেকে সাইকেলে করে এসব জিনিস আমাকে সংগ্রহ করতে হতো। আমি ছিলাম একাধারে লাইব্রেরিয়ান ও স্কুলের টিচার, সমবায় কেন্দ্রের ম্যানেজার, কৃষিশ্রমিক আন্দোলনের সংগঠক এককথায় সবকিছু। সে সময় আমি নিজে যেমন সমাজতন্ত্র সম্পর্কে আরো পড়াশুনা করতে শুরু করলাম, পাশাপাশি ক্যাডারদেরও শিক্ষিত করতে থাকি। ১৯৩২ থেকে ১৯৩৪ যতদিন আমি গ্রামে ছিলাম বরাবরের মতো গ্রাম ছেড়ে চলে না আসার আগ পর্যন্ত এ রকম নানা বৈচিত্রপূর্ণ কাজের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে রেখেছিলাম। ১৯৩৩ এবং ১৯৩৪ সালে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে আমি ঘুরে বেড়িয়েছি এবং চেষ্টা করেছি আমার পুরনো সহযোদ্ধা যারা আমার সঙ্গে বিভিন্ন জেলে বন্দী ছিলেন তাদের সঙ্গে নতুন করে যোগসূত্র গড়ে তুলতে।

আলাগনিপড়ুতে কৃষিশ্রমিকদের সংগঠিত করার সময় জাতীয় বিপ্লবী নেতাদের সঙ্গে যোগসূত্র গড়ে তুলি, বিশেষ করে নেল্লোরের যেসব জাতীয়

বিপ্লবী নেতা ছিলেন যেমন ডুব্বুরী বলরামী রেড্ডি, নাইদি পট্টভিরামী রেড্ডি বা চুন্ডী জগন্নাথম ।

অনেক তরুণ কংগ্রেস নেতা যাদের সঙ্গে একসময় জেলে বন্দী ছিলাম তাদের সঙ্গেও আমার যোগাযোগ হয়। কয়েকজন বিপ্লবী নেতার কথা আগে উল্লেখ করেছি। যাঁদের প্রতি অনেক তরুণ যুবক আকৃষ্ট হচ্ছিলো। তাঁদের আদর্শ লক্ষ্য মহৎ ছিলো, সন্দেহ নাই, কিন্তু যে পন্থায় বা যেভাবে তারা চরম লক্ষ্যে পৌছুঁতে চাইছিলেন তা নিয়ে তাঁদের সঙ্গে আমার মতপার্থক্য ছিলো। আমি ক্রমাগত চেষ্টা করছিলাম মার্কসবাদ লেনিনবাদকে নির্ভর করে আমাদের ছোট্ট দল বা গ্রুপ শুধু মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি নয় দেশব্যাপী যে সংগ্রাম গড়ে তোলার প্রয়াস গ্রহণ করেছিলো, হিংসার পথ ছেড়ে এই জাতীয় বিপ্লবী নেতাদের তার সঙ্গে যুক্ত করতে। আমাদের সমস্ত ভাবনা উদ্যোগ তখন যুক্ত ছিলো কমিউনিস্ট আন্দোলনের অগ্রদূত হিসাবে শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বে গ্রামের খামারের কাজে যুক্ত কৃষিশ্রমিকদের আন্দোলনকে দ্রুত শক্তিশালী ও মজবুত করার প্রতি। তাই আমি ১৯৩২ সালে কৃষি শ্রমিকদের একটি ইউনিয়ন গড়ে তুলি। ইউনিয়নের জন্য একটি সংবিধানও রচনা করি। বহুমুখী যে রণকৌশল আমি আমাদের গ্রামে চালু করতে চেয়েছিলাম এই ইউনিয়ন গঠন তারই একটি অঙ্গ। আমার ধারণা এ ধরনের কাজের মডেল বর্তমান সময়েও সার্বিকভাবে সংগঠন তথা কমিউনিস্ট আন্দোলনকে নানাভাবে শক্তি যোগাবে। গ্রামস্তরে এরকম বহুমুখী কর্মসূচী গৃহীত হলে পার্টি তাতে উপকৃত হবে।

সাংগঠনিক কাজের জন্য গ্রামের যে কিশোর ও যুবকদের আমি সংঘবদ্ধ করতে পেরেছিলাম তাদের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ উদ্দীপনা ছিলো, সমাজ পরিবর্তনের কাজে অংশগ্রহণ করার জন্য তাদের মনে প্রবল আগ্রহ ছিলো। পুষপতি নরসীমা রাজু কোটামরেড্ডি রামন রেড্ডি, পলিচেরিলা শঙ্করাইয়া, রামানাইয়া এবং রামাইয়া প্রধানত: এদের নিয়েই আমাদের গ্রুপ গঠিত হয়েছিলো। এরা সকলে গ্রামের স্কুলে পড়াশুনা করতো। এদের কেউ

আমার থেকে কিছু বড়, কেউ বা কিছু ছোট ছিলো। আমরা সকলে মিলে লাইব্রেরিটি আবার নিজের কিছু বই দিয়ে, কিছু কিনে এভাবে লাইব্রেরিটাকে আবার সচল করলাম। আমরা 'অন্ধ্র পত্রিকা'টিরও গ্রাহক ছিলাম। প্রাথমিক বিদ্যালয়টি আমি পরিচালনা করতাম। বিশেষ করে বিকেলেই ক্লাস হতো। সকালে প্রধানত প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য একটা ডিসপেনসারি চালাতাম। আমার খুড়তুতো ভাই দশরামরামী রেড্ডি একজন ডাক্তার ছিলেন। সম্ভবত: তাঁর তখন এম বি বি এসের ফাইন্যাল সেমিস্টার চলছে। তাকে সাধারণ সাধারণ রোগের চিকিৎসার জন্য কিছু ঔষুধপত্র, আনুষঙ্গিক জিনিসের একটি তালিকা এবং চিকিৎসা করার জন্য একটি নির্দেশিকা তৈরি করে দিতে অনুরোধ করি। তিনি আমাদের ম্যালেরিয়ার জন্য স্কালডিক এসিড, মার্কারী বা রেড অক্সাইড ও আরো পাঁচ ছয় রকমের ওষুধ ও কিছু প্লাস্টিকের জিনিসপত্র সরবরাহ করেছিলেন। এই দিয়ে আমি সকালবেলায় হাসপাতালে চিকিৎসার কাজ শুরু করে দিই। আশেপাশে আর কোন ডাক্তারখানা ছিলোনা। তাই প্রতিদিন অন্তত: ৫০ থেকে ৬০ জন লোক চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে আসতো। গ্রামে এমনকি ফার্স্ট এইড দেওয়ার মতও কোন ব্যবস্থা ছিলো না। আলাগনিপড়ু থেকে অন্তত: পাঁচ মাইল দূরে বীরভালুর আঞ্চলিক গ্রামীণ হাসপাতাল ছিলো একমাত্র ভরসা। গ্রামে কয়েকজন চিকিৎসক ছিলেন, কিন্তু তারা নেহাৎ হাতুড়ে ডাক্তার, তাদের আধুনিক চিকিৎসাপদ্ধতি বা ওষুধপত্র সম্পর্কে কোন ধারণা বা জ্ঞান ছিলো না। অ্যান্টিসেপটিক বা ঘা-নিরোধক কোন ব্যবস্থা তখন ছিলো না। বিশেষভাবে সেজন্য আমরা যখন ডিসপেন্সারিটা চালু করলাম তাতে স্থানীয় মানুষ বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছিলো।

পরবর্তী ধাপে আমরা একটি সমবায় বিপনি খুলি। আমি আমার ভাই-এর কাছ থেকে এক হাজার টাকা ধার নিয়ে নেল্লোর থেকে মুদিখানার সমস্ত রকম জিনিস, এমনকি কাপড় পর্যন্ত কিনে আনি। আমরা ঠিক করি যে এই দোকানটা চালিয়ে আমাদের খুব লাভ করতে হবে এমন নয়, ক্ষতি

না হলেই হলো এমন একটা হিসাব করে, না লাভ বা না ক্ষতি, আমরা দোকানটা চালাব। ক্রেতাদের আমরা দুটো ভাগে ভাগ করি। একদল হলো যারা নিজেদের মজুরির একটা অংশ সমবায়ে দিয়ে সমবায়ের সদস্য হয়েছে, তাদের জিনিসপত্রের দামে একটু ছাড় দেওয়া হতো। অন্য সাধারণ ক্রেতাদের নির্ধারিত মূল্যেই কিনতে হতো। তবে এই নির্ধারিত মূল্যও সেখানকার ব্যবসায়ীরা যে দাম নিতো তার চাইতে অনেক কম ছিলো।

আমাদের দলটি যদিও যুবলীগের অন্তর্ভুক্ত ছিলো না, তথাপি আমাদের কাজকর্ম অনেকটা তাদের সাংগঠনিক পদ্ধতিমতই পরিচালিত হতো। যেমন লাইব্রেরি চালানো, শিশুদের বা বিকেলে বয়স্কদের পড়াশুনা শেখানো ইত্যাদি। কিন্তু আমাদের গ্রুপ প্রথমে সমবায় চালানোর কথা ভাবে এবং আলোচনা পর্যালোচনা করে বাস্তবেও সমবায়ের কাজ শুরু করে দেয়। আমাদের দোকান চালু হওয়ার ফলে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের স্বার্থে আঘাত লেগেছিলো তাতে কোন সন্দেহ নাই। এর প্রধান কারণ আমি তো কোন পারিশ্রমিক ছাড়াই কাজ করতাম। তাছাড়া আমাদের মালপত্র পরিবহনের খরচাও খুব কম পড়তো। সাধারণত: আমি সাইকেলে করে নেল্লোর গিয়ে সব জরুরি জিনিসপত্র কিনে আনতাম। মালপত্র খুব বেশি হয়ে গেলে যেমন কেরোসিনের টিন, বড় বড় চটের থলে ইত্যাদি আমি বাসে করে নিয়ে আসতাম। সব চেয়ে কাছের বাসস্টপ আমাদের গ্রাম থেকে প্রায় দু'মাইল দূরে। ব্যবসায়ীরা সাধারণত: গরুরগাড়ি ভাড়া করে আনত। আমরা পরিবহনের জন্য বেশি পয়সা খরচ করতাম না। বাসস্টপ থেকে কেরোসিনের টিন আর বড় বস্তাগুলি সাইকেলে করে নিয়ে আসতাম। আর এজন্য আমাদের সমবায় কেন্দ্রে জিনিসপত্রের দাম অনেক কম ছিলো। ফলে ক্রেতারা সব আমাদের দোকানে এসে ভীড় করতো। ব্যবসায়ীদের তো পেশাই ছিলো এটা। এই জিনিসপত্রে বিক্রি করেই এদের দিন গুজরান হয়। অন্যদিকে আমি তো জীবিকা নির্বাহের জন্য এই দোকানের উপর নির্ভরশীল ছিলাম না। আমার জীবিকা নির্বাহের অন্য ব্যবস্থা ছিলো।

এইসব ব্যবসায়ীদের মনোবৃত্তি ছিলো খুব অদ্ভুত। বড় বড় জমিদার বা ধনী পরিবারগুলির সঙ্গে এরা খুব সাবধানে ব্যবসাবাণিজ্য করতো। কিন্তু গ্রামের গরিব মানুষদের ঠকাবার জন্য যত রকম ছলচাতুরি পারে তা করতো ওজনে, দামে সবদিকে ঠকাত। গ্রামে তখন পণ্য বিনিময় প্রথা চালু ছিলো। ওদের খাদ্য শষ্যের পরিবর্তে অন্য প্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে হতো। এই ব্যবসায়ীরা শষ্য কম দাম ধরতো কেনার সময় খুব । পক্ষান্তরে অস্বাভাবিক চড়া দামে দোকানের জিনিসপত্র বিক্রি করতো। ওজনেও কম দিতো। আমাদের দোকানে এসব ছিলো না। বাজার দরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই গ্রামের মানুষের কাছ থেকে শষ্য কিনতাম আমরা এবং বিনিময়ও হতো তার ভিত্তিতে। 'যারা ওজনে আর দামে ঠকায়—তাদের থেকে দূরে থাকো, মুক্ত হও'—এসময়ে এটা আমাদের শ্লোগান হয়ে উঠলো।

আমার নিজের পরিবারে প্রথম এটা শুরু করলাম। ক্রমে আমাদের দলের চাপে পড়ে অন্যান্য পরিবারগুলিও মাপে ঠকানোর অভ্যাস পরিত্যাগ করলো। গ্রামে একটা শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলতে পেরেছিলাম আমরা। শেষ পর্যন্ত ঐ ব্যবসায়ীরা যারা এতদিন ধরে গরিবদের শোষণ করে আসছিল তারা একটা বোঝাপড়া বা সমঝোতার জন্য আমার কাছে আসে। তারা বললো তারা জিনিসপত্রের দাম কমাবে, আর সমবায় কেন্দ্রটিও তারাই চালাবে। ওরা বললো, " আপনি আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করছেন কেন? এই ব্যবসা বাণিজ্যের কাজ আমরা দেখবো।" সমবায় কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা থেকে আমার সরে দাঁড়ানোর অর্থ হলো সমবায় ভান্ডারটি চালাবার জন্য ওদের নিয়োগ করা। আমি যদি তা করতাম তবে ধীরে ধীরে সমবায় কেন্দ্রটি শুধু বন্ধ হয়ে যেতো না, এভাবে আবার চিরাচরিত শোষণের রাস্তা ধরে চলার সুযোগ পেতো। তাই আমি তাদের বললাম, সমবায় ভান্ডার যেমন চলছে চলুক। প্রয়োজন হলে আমি নিশ্চয়ই আপনাদের প্রস্তাব বিবেচনা করবো এবং আপনাদেরকে নিয়োগ করবো।

আমার খুড়তুত ভাই বীরা রেড্ডি প্রায়ই বিক্রয় কেন্দ্রটি দেখতে

আসতো। আমার পড়াশুনা ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারটা তাঁর খুব খারাপ লেগেছিলো। তাঁর মনে গভীর আশা ছিলো যে লেখাপড়া শিখে আমি সমাজের একজন উঁচুদরের মানুষ হবো। আমার এধরনের দৃঢ় সিদ্ধান্তের ফলে তাঁর সব আশা একেবারে ধুলিসাৎ হয়ে যায়। তিনি প্রায়ই আমাকে বলতেন আমার যখন কলেজে গিয়ে পড়াশুনা করার সময় আমি তা না করে গ্রামে বসে সমবায় কেন্দ্র খুলে আর স্কুল লাইব্রেরি পরিচালনা করার মত তুচ্ছ কাজ করে অযথা সময় নষ্ট করছি। আমার এ সিদ্ধান্তে তিনি খুব দুঃখিত হলেও প্রায়ই নানা হাল্কা ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য করে তার মনের ক্ষোভ প্রকাশ করতেন। আমি তাকে বলি যে পড়াশুনা ছেড়ে দেওয়াতে আমার নিজের কোন দুঃখ নেই কারণ গ্রামে আমি একটা সমাজসেবামূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত আছি। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতাম যে এই অত্যাচারিত নিপীড়িত মানুষেরা ঐক্যবদ্ধভাবে খুব শীগগিরই তাদের জীবনের পরিবর্তনে সক্ষম হবে— সেদিন খুব বেশি দূরে নয়, কবে সমাজের পরিবর্তন হবে এই অপেক্ষায় তারা বসে থাকবে না।

স্থানীয় যুবকদেব স্বেচ্ছাশ্রমে সমবায় কেন্দ্রটি খুব সফলভাবে পরিচালিত হচ্ছিলো। গ্রামের মানুষ এই প্রথম সমস্ত রকম শোষণ আর প্রবঞ্চনা থেকে মুক্তির স্বাদ পেলো। গ্রাহকদের দিক থেকেও কোন প্রবঞ্চনা বা তঞ্চকতা ছিলো না। তারা আর শষ্যের সঙ্গে পাথর, ঘাসের গুটি এসব মিশিয়ে আনতো না। আমাদের গ্রামের খবর এই ছোট্ট ছোট্ট পরিবর্তনে অঞ্চলের সমস্ত গ্রামে ছড়িয়ে পড়লো। মানুষ বলাবলি করতে শুরু করলো— 'সুন্দরাইয়া' বলে একজন লোক একটা সমবায় দোকান খুলেছে, যার ফলে গ্রামের গরিব মানুষজন খুবই উপকৃত হচ্ছে। আমাদের লাইব্রেরি আর স্কুলের কাজকর্ম নিয়েও অন্যান্য গ্রামের মানুষের মধ্যে যথেষ্ট আলোচনা চলতে থাকে। পার্শ্ববর্তী গ্রামের লোকজনরা আমাদের দোকান দেখতে আসা শুরু করে দিলো। তারা জিনিসপত্রও এখান থেকে কিনে নিয়ে যেতে আরম্ভ করলো। কিশোর যুবক সকলেই গ্রামের লাইব্রেরিতে এসে বইপত্র পড়া এবং স্কুলেও কেউ কেউ পড়াশুনা করতে আরম্ভ করে দিলো। এখন আর

তাস বা মার্বেল খেলে সময় নষ্ট করে না এরা। সবকিছুর মধ্যেই একটা উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছিলো। নানাবিধ কাজে এত ব্যস্ত হয়ে যাওয়াতে আমার একটু অসুবিধা হতে থাকে। সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর নৈশ বিদ্যালয় চালানো ক্রমশই আমার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। একটা সময় নৈশ বিদ্যালয়টি আমি বন্ধ করে দেবো ভাবছিলাম। কিন্তু ততদিনে তরুণ বয়সের কৃষকদের মনে জানবার জন্য শিক্ষার জন্য একটা আগ্রহ সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিলো। কোন একটা বিষয় আলোচনার জন্য তারা আমার কাছে চলে আসতো। পাশাপাশি এরা নানারকম বইও পড়তে শুরু করে দিয়েছিলো। এভাবে ওরা বিভিন্ন জিনিস জানতে পারছিলো, লিখতে পারছিলো। এভাবে এরা প্রগতিশীল চিন্তা ভাবনা, গান্ধীজির দর্শন, বালগঙ্গাধর তিলক, বিপ্লবী ভগৎসিং এর মতো মহাপুরুষদের জীবনী ইত্যাদি বহু বিষয়ের সঙ্গে পরিচিত হতে থাকে। তখন গ্রামে কোন উচ্চ বিদ্যালয় বা অন্য কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিলো না, তথাপি ওদের মধ্যে জ্ঞানের বিকাশ ঘটতে থাকে। ক্রমশঃই গ্রামটি একটি সামাজিক পরিবর্তনের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলো।

স্বাস্থ্য পরিষেবার কথা বলতে গেলে আমরা একটা ছোট্ট ডিসপেন্সারি খুলি। আমাদের উদ্দেশ্য ছিলো গ্রামে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, গ্রামের লোকদের প্রাথমিক চিকিৎসা করা, সাধারণ অসুখের ওষুধ দিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। আমাদের ডিসপেনসারিতে যথেষ্ট পরিমাণ ওষুধ ছিলো। বলা যায় যেকোন রকম আঘাত নিয়ে প্রচুর মানুষ আসতো ডিসপেনসারিতে। প্রথমেই কোন অ্যান্টিসেপ্টিক ওষুধ দিয়ে ক্ষতস্থান ভালো করে পরিষ্কার করে ড্রেস করে দিতাম। জ্বরের রোগীদের ক্লোরোকুইন ট্যাবলেট দিতাম। একটি ঘটনার কথা আমি কখনো ভুলবো না। একদিন একজন মহিলা এলেন চিকিৎসার জন্য। সে তার ব্লাউজ খুলে তার একটি স্তন টেনে বার করে দেখালো, তাতে একটি বিরাট ক্ষত ছিলো। আর সে এই ক্ষতস্থানটির মধ্যে একটি কাপড় ঢুকিয়ে রেখেছিলো, ক্ষতস্থান থেকে পুঁজ রেরোচ্ছিল। সে চাইছিলো আমি এটার চিকিৎসা করি। আমি তাকে বললাম যে এত গভীর ক্ষত চিকিৎসা করে ভালো করার মতো দক্ষতা আমার নেই, আমি তাকে

বীরভেলেরের আঞ্চলিক চিকিৎসা কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেবো। ওখানে এসব কেইসের একজন পেশাদার ডাক্তার থাকেন। আমরা যেসব রোগী পাঠাতাম তাদের তিনি খুব যত্নের সঙ্গে চিকিৎসা করতেন। আমাকে তিনি যথেষ্ট ভয় ও সমীহ করতেন। কারণ কৃষিশ্রমিক ইউনিয়ন ও আমাদের গ্রুপ তখন খুব শক্তিশালী ছিলো। আমাদের পাঠানো রোগীকে তিনি কখনো প্রত্যাখ্যান করতেন না বা অযত্ন অবহেলা করতেন না। কিন্তু মহিলাটি সেখানে যেতে কিছুতেই রাজি হলো না। সে বললো যে, এসব কাজে আমার হাত খুব ভালো একথা জেনে সে এখানে এসেছে। আমি তাকে বারবার বোঝাতে চাইলাম যে ঐ আঞ্চলিক হাসপাতালের চিকিৎসায় সে ভালো না হলে তাকে নেল্লোর হাসপাতালে পাঠাবো। এর জন্য তার কোন টাকা পয়সা লাগবে না; সমস্ত খরচ আমি বহন করবো। নেল্লোরের অনেক লোকের সঙ্গে আমাদের তখন চেনাজানা হয়ে গেছে। কিন্তু তার চাপাচাপিতে বাধ্য হয়ে আমি ক্ষতস্থান ড্রেস করে দিই। পরে সে বীরাভেলোর বা নেল্লোরে গিয়েছিলো কিনা জানি না। কারণ তারপর দিন বা আর কোন দিনই সে আসেনি।

এরকম আরো একটি ঘটনার কথা মনে আছে। পায়ের মধ্যে একটি দূষিত ক্ষত নিয়ে একদিন এক রোগিনী আসে। সে ক্ষতের মধ্যে কোন পাতার রস ঢুকিয়ে কাদা দিয়ে প্রলেপ দিয়ে এসে হাজির হয়েছিলো। আমি বুঝতে পারছিলাম যে তার প্রচন্ড যন্ত্রণা হচ্ছে। ক্ষতের মধ্যে হাইড্রোজেন প্যারাক্সাইড দিয়ে ধীরে ধীরে গরম জল দিয়ে পরিষ্কার করতে থাকি। ঐ পাতার রস আর কাদা শক্ত আঠার মত হয়ে গিয়েছিলো যে তাকে যথাসম্ভব কম ব্যথা দিয়ে খুব সন্তর্পণে একটা পরিষ্কার করতে আমার ১৫ থেকে ২০ মিনিট সময় লেগেছিলো। তারপর এটাকে ব্যান্ডেজ করে একটা অয়েন্টমেন্ট লাগিয়ে দিই। এইভাবে গরম জল দিয়ে পরিষ্কার করে ওষুধটা বারবার লাগাবার জন্য তাকে বলি। এরকম বিষাক্ত ঘায়ে সাধারণত: অ্যান্টিটিটেনাস ইনজেকশন দিতে হয়। দুর্ভাগ্যবশত: আমাদের কাছে তখন এসব ছিলো

না। যদিও এরকম জটিল রোগাক্রান্তদের বীরাভেলোর বা নেল্লোর রেফার করতাম, কিন্তু প্রাথমিক যে যত্ন আমাদের ডিসপেনসারিতে নেওয়া হতো গরিব মানুষের উপর তার বিরাট প্রভাব পড়েছিলো। শুধু আমাদের গ্রামে নয় আশেপাশের পাঁচ মাইলের মধ্যে যত গ্রাম ছিলো এই সকল গ্রামের গরিব মানুষের মধ্যেই এর প্রভাব পড়েছিলো।

যতই দিন যেতে লাগলো আমাদের কাজকর্মের প্রতি কাবুর ও নেল্লোর জেলার শিক্ষিত লোকেরাও আকৃষ্ট হতে লাগলেন। দুটো জেলাতেই শিক্ষিতের হার বেশি। তারা আলোচনা করতেন 'সুন্দরাইয়া বলে একজন লোক, যিনি গান্ধীবাদের দৃঢ় সমর্থক অথচ গুরুত্বপূর্ণ হলো এই যে তিনি একজন কমিউনিস্ট, যিনি নানাভাবে গরিব মানুষদের সাহায্য করছেন তাদের সেবা করে চলেছেন।' আমাদের অন্যান্য কাজকর্ম, খেতমজুরদের ইউনিয়ন গঠনের খবরও তাদের কাছে পৌঁছে গিয়েছিলো। আমাদের গ্রুপের সদস্যদের চার পাঁচজন একসঙ্গে দলবেঁধে পিঠের মধ্যে গানি-ব্যাগ নিয়ে বাড়ি বাড়ি যেতেন। শ্রমিকরা সপ্তাহান্তে মজুরি হিসাবে যে শষ্য পেতো তার একটা অংশ সমবায় কেন্দ্রের জন্য দান করে সমবায়ের সদস্য হবার জন্য অনুরোধ জানাতেন তারা। একথা সত্য যে এদের মধ্যে অনেককেই আমরা সমবায়ের সদস্য করতে পারিনি। কিন্তু আমরা কি করতে চাই, আমাদের উদ্দেশ্য কি তা বিস্তৃতভাবে বুঝিয়ে বলার পর অনেক হরিজন স্বেচ্ছায় খেতমজুর ইউনিয়নের সদস্য হয়েছিলেন। প্রত্যেক বাড়ি থেকে না হলেও একটি ভারি সংখ্যার শ্রমিক এসব ইউনিয়নে যোগ দিয়েছিলেন। এভাবেই আমরা জুতা প্রস্তুতকারীদের সংগঠিত করতে পেরেছিলাম। তাঁত শিল্প শ্রমিক ও অন্যান্য অংশের শ্রমিকদেরও ইউনিয়নের আওতায় আনার চেষ্টা করেছি। কিন্তু তারা আমাদের ইউনিয়নে যোগ দেয়নি। কারণ রেড্ডিদের সঙ্গে তাদের একটা পুরনো বিরোধ ছিল। তবে তারা আমাদের কাজের প্রশংসা করতো এবং আমাদের যথেষ্ট সমীহও করতো। তাদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব হলে আমরা মধ্যস্ততা করেছি, আমাদের কথায় তারা ঝগড়া বিবাদ থেকে বিরতও হয়েছে। পরে

আমি শত্রুতা ছেড়ে তাঁত শ্রমিকদের সঙ্গে বিরোধিতা না করে একটা মীমাংসায় আসার জন্য জমিদারদের চাপ দিতে থাকি।

আমাদের আন্দোলন যখন বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠে তখন ছোট কৃষকরাও আমাদের কাছে আসতে শুরু করে। তারা তাদের দুঃখ বেদনার কথা আমাদের বলতো। বিশেষত: বড় বড় জমিদাররা যে ছোট কৃষকদের গবাদি পশু ফার্মের চারণভূমিতে বা খালের জল ব্যবহার করতে দিতো না। ক্যানেল বা খালের জল গ্রামের বড় বড় জলাশয়গুলিতে আসতে দিতো না — এতে ছোট কৃষকরা তাদের গরু মোষ স্নান করাতে পারতো না এমন কি গরু মোষের তেষ্টা মেটানোর জলও পাওয়া যেত না কখনো কখনো। গোচারণ ভূমি বা গবাদি পশুর জন্য জলাশয়গুলিতে ধনী কৃষকদেরই একচেটিয়া অধিকার ছিলো। আর ছিলো আপাদমস্তক দুর্নীতি। খালাসী থেকে ইঞ্জিনীয়ার পর্যন্ত সকলেই চরম দুর্নীতিগ্রস্ত ছিলো। এইসব অব্যবস্থাকে সুস্থিত করার জন্য আমাদের মধ্যস্থতা করতে হতো। কখনো কখনো আমরা গিয়ে হল্লা চিৎকার করতাম। কিন্তু তাতে কোন কাজ হতো না। এসব বিষয়ের সুষ্ঠু মীমাংসার জন্য আমাদের আরো শক্তিবৃদ্ধি প্রয়োজন হয়ে পড়ে। গরিব মানুষের স্বার্থে পরিচালিত আমাদের বহুমুখী কর্মসূচীর ফলে গ্রামের সমস্ত মানুষ আমাদের মর্যাদার চোখে দেখতো।

সেটা ১৯৩২ সাল। কংগ্রেসের নেতৃত্বে যে জাতীয় আন্দোলন চলছিল তাতে অংশগ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত নিলাম আমি। আমার তখন আশুকর্তব্য হয়ে উঠলো যে সব কংগ্রেসকর্মীরা গ্রেপ্তারবরণ করে জেলে যাচ্ছিলেন তাদের নিরস্ত করা, নিরুৎসাহিত করা। কারণ এই কারাবরণের মধ্য দিয়ে কখনোই স্বাধীনতা লাভ সম্ভব হবে না। বরং গরিব অংশের মানুষের জন্য যে বহুবিধ কর্মসূচী আমরা গ্রহণ করেছিলাম তাতে তারাও যদি অংশগ্রহণ করে তবে দেশের মানুষের অনেক উপকার হতে পারে। একথা অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে আমি তাদের বোঝাতে চেষ্টা করছিলাম। সে সময় অনেক তরুণ জাতীয় আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে কারাবরণে আগ্রহী ছিলেন। আর যারা আগে জেলে

গিয়েছিলেন তারা অনেকেই ব্যক্তিগত চিন্তাভাবনা থেকে নিজের মত করে বিপ্লবীপথ গ্রহণ করেছিলেন। এদের একজন হলেন মাইপদুর ছুব্বুরী বলরামী রেড্ডি। তিনি আমার দ্বিতীয় শালা জয়বালের খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন। চিন্তাভাবনার দিক থেকে খুবই প্রগতিশীল ছিলেন তিনি। ১৯৩১ সালে তিনি নেল্লোর জেলে ছিলেন।

চুন্ডি জগন্নাথ তখন সবে পড়াশুনা শেষ করেছেন এবং জাতীয় আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। নাইদি পট্টভিরামী রেড্ডি — তার নাম কিছুদিন আগেও মনে করতে পারছিলাম না, একটি বোমার কেইসে জড়িত ছিলেন। কন্তাপতি সিনিয়র কাকিনাড়াতে এ সংক্রান্ত কিছু কাগজপত্র আমাকে দেওয়ার পর আমি তা জানতে পারি। পরে রেবেলা গ্রামের কোন জমিদার তাদের পরিবারের কোন মহিলার সাথে অবৈধ সম্পর্ক ছিলো এই সন্দেহের বশবর্তী হয়ে তাকে খুন করে। পুরো বিষয়টা আমার জানা নেই। কিন্তু জাতীয় আন্দোলনের সময় তিনি একজন বড় মাপের নেতা ছিলেন। তাই আমি তার সঙ্গে যোগাযোগ করি। এক বড় দল গঠন করে তারা আমাদের মত কাজকর্ম চালাতে রাজি হয়েছিলেন। তারা মনে করতেন সংগঠনের কাজের জন্য ব্যাঙ্কলুট করা ধনী জমিদারদের আক্রমণ করে ধন সম্পদ লুণ্ঠন করা কোন অপরাধ বা দোষের কাজ নয়। একথা তারা প্রতিষ্ঠিতও করতে চাইতেন। বলতেন তাদের কাজ হলো অর্থ সংগ্রহ করা আর আমাদের দায়িত্ব হলো সমাজের সেবা করা। আমি তাদের সঙ্গে একমত ছিলাম না। আমি তাদের বলি অর্থ সংগ্রহ করতে হলে তা জনগণের কাছ থেকে সংগ্রহ করতে পারে। অনেক দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখাই যে বিপ্লবীরা এরকম বিচ্ছিন্নভাবে বা ব্যক্তিগতভাবে লুঠতরাজ করে ইত্যাদি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে টলাতে পারেনি। আমি তাদের বলি এরকম হিংসার পথে চলে খুশ হয়ে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝোলার কোন অর্থ নাই। একটা বড় অপারেশনের সময় যে কোন সন্ত্রাসবাদীর পক্ষেই একটা ভুল হয়ে যাওয়া খুব স্বাভাবিক। এই ছোট্ট একটা ভুলের জন্য তাদের সমগ্র পরিকল্পনাটা ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। এরকম জোর জবরদস্তি

করে অর্থসংগ্রহ করে কি লাভ। এই অর্থ হয়তো শেষ পর্যন্ত তাদের নিজেদের আত্মরক্ষার জন্য অথবা আরো অস্ত্র সংগ্রহের জন্য ব্যয় হবে। এটা একটা বিভ্রান্তিকর পথ যা প্রকৃতপক্ষে আন্দোলনের সহায়ক নয়। তাদের এই ব্যক্তিগত আত্মত্যাগের বিনিময়ে হয়তো কোন কিছুই পাওয়া যাবে না। তাই এধরনের পথ কিছুতেই অবলম্বন করা যায় না।

এসব আলোচনা তর্কবির্তক হলো তাদের সঙ্গে যোগাযোগের প্রথম পর্বের কথা। ধীরে ধীরে আমি তাদের মার্কসবাদ ও লেনিনবাদের সঙ্গে পরিচিত করে কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার অনুরোধ জানাই। তারা জানান আমার প্রস্তাব তারা বিবেচনা করবে। একথা সত্য যে আমি তাদের তখনও রাজি করাতে পারি নি। তাদের আমি বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিতান্ত্রিক বিপ্লবী পথ না নিতে বলি যদিও এতে আমার কোন সমস্যা ছিল না। আমি বুঝেছিলাম তারা তাদের পথ পরিত্যাগ করবে না। আমি ভালোভাবেই জানতাম এই হিংসার রাজনীতি তারা ছাড়বে না, তারা তাদের মত করেই কাজ চালিয়ে যাবে। আমার সঙ্গে কয়েকজন তরুণ যুবক ছিলো যারা এই বিপ্লবী পথে পা বাড়ায়নি। আমাদের কথাবার্তার উপর তাদের আস্থা ছিলো, আমাদের আলোচনা আবেদনও ছিলো অনেক উন্নত। একদিন তারা এসে বলল যে কপিরালা ভেঙ্কটচারিকে পুলিশ খুঁজছে। তাকে কিছুদিনের জন্য আশ্রয় দিতে পারবো কিনা জানতে চাইলো ওরা। আমি তাদের বললাম আমি তাদের চিন্তাভাবনা আর্দশের বিশ্বাসী নই তথাপি যদি সত্য সত্যই এরকম পুলিশের ভয় থাকে তবে ভেঙ্কটচারিকে আশ্রয় দিতে আমি প্রস্তুত। তাকে আমার নিজের বাড়িতেই আশ্রয় দিতে হলো, কারণ এখানে কোন সন্দেহ বা অবিশ্বাসের ব্যাপার ছিলো না। অন্য কোন বাড়িতে তাকে রাখার মত আমাদের আন্দোলন তত জোরালো হয়ে উঠেনি তখন। আমি বিপ্লবীদের একজন আশ্রয়দাতা এমন রটনা শুরু হয়ে গেলো গ্রামে। আর এক জনের পর একজন বিপ্লবী এসে দেখা করে যেতে লাগলো আমার বাড়িতে। আমার নাম এমনিতেই পুলিশের খাতায় ছিলো। তারা আমার গতিবিধির উপর নজর

রাখতো। তাই সতর্কতা হিসাবে ভেঙ্কটচারিকে গ্রামে আমাদের যে আত্মীয়স্বজন ছিলো তাদের এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে সরিয়ে সরিয়ে রাখতাম।

ক্রমশ: অবস্থার অবনতি ঘটতে লাগলো। পুলিশের নজরদারি বেড়েই চললো। চারিকে আর বেশিদিন আশেপাশের গ্রামে লুকিয়ে রাখা সম্ভব ছিলো না। তাই দুব্বারী বলরামি রেড্ডি যিনি তখন নেল্লোরে গোপনে সংগঠন গড়ে তুলছিলেন তার কাছে চারিকে পাঠিয়ে দেবো বলে ঠিক করলাম। চারি সাইকেল চালাতে পারতো না। তাই সাইপদু পর্যন্ত দীর্ঘ ৩০ মাইল রাস্তা তাকে আমার সাইকেলের পেছনে বসিয়ে নিয়ে যেতে হলো। যেরকম ভাবা গিয়েছিলো তাই হল। কোন আক্রমণাত্মক ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থাকার কারণে কয়েকদিনের মধ্যেই এদের সকলকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। পরে জগন্নাথম বলেছিলেন, তাদের সম্পর্কে না জানিয়ে তারা ভুল করেছিলেন। আমি বলেছিলাম, ওরা কি করছিলেন তা আমি জানতাম এবং আশ্রয় দেওয়ার পরিণতি কি হতে পারে তা জেনে বুঝেই আমি তাকে আশ্রয় দিয়েছিলাম। আমি আরো বললাম এমন ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করে কারাদন্ড ভোগ না করে তারা যদি আমাদের আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতেন তবে তা অনেক কাজে লাগতো। এ ধরনের গুপ্ত সংগঠন চালিয়ে কোন লাভ হয় না, একথা তারা একদিন অনুভব করতে পারবেন। সে সময় তারা খুব একটা কিছু করতে পারেনি কিন্তু মাদ্রাজ হাইকোর্টে গুটি ষড়যন্ত্র মামলার শুনানী আরম্ভ হলো। তারা যখন বোমা ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র এক জায়গা থেকে অন্য জায়গাতে স্থানান্তরিত করছিলো তখন বার্মা শেল স্টোরে একটি বোমা হাত থেকে পড়ে ফেটে যায় এবং বিস্ফোরণ ঘটে, তাতে একজন বা দুজন নিহত হয় ও তাদের সকলেই এই বিস্ফোরণে আহত হন। প্রকাশম প্যান্টালু তাদের হয়ে মামলা লড়েন তবু তাদের সাত বৎসরের জন্য কারাদন্ড হয়। এটাই হলো বিপ্লবীদের সঙ্গে আমার যোগাযোগের একটা পর্ব।

১৯৩২/ ৩৩ সাল পর্যন্ত আলাগনিপড়ুতে আমাদের কাজকর্ম চালু ছিল। একটা গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে গান্ধীজি সত্যাগ্রহ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলেন। কারাবাসের সময় যে সহকর্মীরা আমার সঙ্গে ছিলেন তাদের সঙ্গে

যোগাযোগ স্থাপন করা ছাড়া আমার কাজ আর বেশিদূর এগোতে পারেনি। এসময়টা আমি গভীরভাবে মার্কসবাদ লেনিনবাদ অধ্যায়নে নিমগ্ন ছিলাম। পাশাপাশি ক্যাডারদের রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার চেষ্টা করছিলাম। জেল থেকে কেউ মুক্তি পেলেই তাঁর সঙ্গে দেখা করে তাঁদের আমার বাড়িতে আলোচনার জন্য আমন্ত্রণ করতাম। সংগঠনকে মজবুত করার জন্য তাদের সকলের সঙ্গে সমন্বয় গড়ে তোলার প্রয়োজন ছিল। প্রধানত, আমাদের গ্রুপের যুবকদের সচেতন করার জন্য, শিক্ষিত করার জন্য আমি কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো, রাষ্ট্র ও বিপ্লব, কি করিতে হইবে, মজুরি শ্রম ও পুঁজি ইত্যাদি গ্রন্থগুলি তেলেগু ভাষায় অনুবাদ করি। বামপন্থী সাম্যবাদ গ্রন্থটিও অনুবাদ করি। এই অনুবাদ কাজে প্রসাদ রাও আমাকে সাহায্য করেছিলো। ইতোমধ্যে মীরাট যৌথ ঘোষণার বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছে। আর আমি বঞ্চিত নিপীড়িত মানুষদের একজন প্রবল সমর্থক আর অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে একজন বিদ্রোহী বা ধর্মযোদ্ধা হিসাবে সকলের কাছে পরিচিত হয়ে উঠি। একজন কমিউনিস্ট হিসেবে আমি সকলের কাছে আদৃত হতে থাকি। বস্তুত: আমার গ্রামে ফিরে আসা থেকে আমির হায়দার খানের সঙ্গে দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ হওয়া পর্যন্ত সময়ের মধ্যে মার্কসবাদ লেনিনবাদ সম্পর্কে আরো অধ্যয়ন করার জন্য আমাকে মস্কো পাঠাবার প্রস্তাব হয়।

ভি কে নরসীমাকে বোম্বেতে তার পরিচিতদের মাধ্যমে আমাকে মস্কো পাঠাবার দায়িত্ব দেওয়া হয়। অর্থসংগ্রহ করা তেমন কঠিন ছিলো না। আমার পরিবারের লোকজনদের কাছেও চাইতে পারতাম। কিন্তু সমস্যা হলো তারা আমার রাশিয়া যাওয়ার ব্যাপারে সম্মত ছিলেন না। তাই আমি দশরথরামী রেড্ডির ভাই-এর সঙ্গে দেখা করে আমাকে কিছু অর্থ সাহায্য করতে অনুরোধ করি। আমি তাকে বলি এ টাকা আমি যত তাড়াতাড়ি পারি ফেরত দেবো। ভি কে নরসীমা তখন একটি বিশেষ প্রতিশ্রুতিপত্র সাক্ষর করে জেলের বাইরে ছিলেন। তিনি কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিশীল ছিলেন। বোম্বের কিছু ইনস্যুরেন্স কোম্পানিতে কর্মরত কমরেডদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিলো। আমি তাঁর বাড়িতে গিয়ে

তাঁর সঙ্গে দেখা করি। তাঁর শ্বশুরমশায় আমাকে দেখে খুব খুশি হয়েছিলেন। তিনি আমার কারাবাসের খবর জানতেন। এমনকি জেলে খাদ্যের প্রশ্নে আমার সত্যাগ্রহ সম্পর্কে তিনি অবগত ছিলেন। জেলের নিকৃষ্ট রাগীজাতীয় খাবারও হজম করার ক্ষমতার জন্য আমার হজম শক্তির খুব প্রশংসা করলেন তিনি। নরসীমার কাছ থেকে একটা চিঠি নিয়ে বোম্বেতে অধ্যাপক মিশ্রর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। তিনি আমির হায়দার খানেরও একজন সহযোদ্ধা ছিলেন। একটা বস্তিতে থাকতেন তিনি। তাঁর জীবনযাপন ছিলো খুবই সাধারণ। তিনি অধ্যাপক হিসাবে পরিচিত ছিলেন। যদিও তাকে দেখে আমার মনে হয়নি যে তিনি একজন অধ্যাপক। শ্রমিকশ্রেণি থেকে উঠে এসেছিলেন তিনি। তিনি বললেন যে, আমার মস্কো যাবার ব্যবস্থা তিনি অবশ্যই করবেন তবে তা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে যুদ্ধবিগ্রহ চলছিলো তার একটা কিনারা হবার পর। তখন জার্মানির রণহুঙ্কার চলছে আর তা বিশ্বশান্তির পক্ষে বিশেষ করে ইউরোপের দেশগুলি এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে আশঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বোম্বেতে যুব লীগের কাজকর্ম ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত ছিলো। এবং অন্যান্যরা নিজেদের মত করে কাজকর্ম করছিলেন। কিন্তু তাদের সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সম্পর্ক ছিলো। ১৯৩২ এর অক্টোবরের শেষদিকে আমি বোম্বে গিয়েছিলাম। কমরেডগণ বললেন তারা আমার রাশিয়া যাবার ব্যবস্থা চূড়ান্ত করে আমাকে জানাবেন। কিন্তু তার বাস্তবায়ন আর সম্ভব হলো না। জার্মানীর হিটলার দ্রুত অগ্রসর হচ্ছিলেন। সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলো। তাই আমি গ্রামে ফিরে গিয়ে রাজনৈতিক ও সামাজিক কাজে ব্যাপৃত হতে বাধ্য হলাম।

১৯৩৩ সালে কম্যুনাল এওয়ার্ড (Communal Award) আইন পাস হয়। গান্ধীজি দুর্বল অংশের মানুষদের সচেতন করার জন্য, জাগ্রত করার জন্য এবং হরিজন কল্যাণমূলক কাজের জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সমস্ত দেশ ভ্রমণের কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন। এর আগে এই আইনকে

চ্যালেঞ্জ করে তিনি দীর্ঘদিন অনশন করেছেন। এই ভ্রমণসূচীর অঙ্গ হিসাবে তিনি নেল্লোর এসেছিলেন। জাস্টিস পার্টির কর্মীরা তাঁকে সভা করতে দেবে না বলে ভীতি প্রদর্শন করেছিলো। জাস্টিস পার্টির গুন্ডাদের আক্রমণ থেকে সভাতে উপস্থিত সাধারণ মানুষকে রক্ষা করার জন্য আমরা সকলে স্বেচ্ছাসেবক নির্বাচিত হলাম। জাস্টিস পার্টির ওয়ার্কাররা আসলে ছিলো জমিদারদের লোক। আমাদের গ্রাম থেকে একটা স্বেচ্ছাসেবক স্কোয়াড নিয়ে আমি সেখানে গেলাম। মাইদুরি নিকটবর্তী মাইপদু গ্রাম থেকে অনুরূপ আরেকটি স্কোয়াড নিয়ে গান্ডবরাপু হনুমা রেড্ডিও (Gandavarapu Hunuma Reddy) সেখানে এলেন। তাঁর খুব আস্থা ছিলো আমার উপর। তাই এই সমস্ত স্বেচ্ছাসেবকদের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দেওয়া হলো আমাকে। স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যেও কংগ্রেস কমিউনিস্ট উভয় দলের সমর্থক ছিলো। আমি তাদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলিতে মোতায়েন করে দিলাম। ফলে ঐ জমিদাররা আর সভাস্থল অক্রমণের দুঃসাহস দেখায়নি। এবার একটা নতুন সমস্যা দেখা দিল। গান্ধীজি হরিজনদের সঙ্গে নিয়ে গঙ্গাভরমে একটা মন্দিরে যাবেন বলে ঠিক হলো। জেলা কংগ্রেস সভাপতি সেশা রেড্ডির গ্রামের বাড়ি ছিল ওখানে। সেখানে নানা সমস্যা হতে পারে বলে তারা আশঙ্কা করছিলেন। আমাদের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে গঙ্গাভরমে তাদের সুরক্ষা দেবার দায়িত্ব দেওয়া হলো। গান্ধীজি পৌঁছুবার আগে আমাদের সেখানে যেতে বলা হলো। আমরা গ্রামটির কাছাকাছি যেতেই সেশা রেড্ডি বিরোধী কিছু লোক আমাদের বাধা দিয়ে থামিয়ে দিলো। আমরা বললাম, আমরা স্বেচ্ছাসেবক। পরের দিন গান্ধীজি এই গ্রাম পরিদর্শনে আসবেন তারই ব্যবস্থা করতে এসেছি। তারা বলল তারা জানে গান্ধীজি এখানে হরিজনদের মন্দিরে প্রবেশ করানোর উদ্দেশ্য নিয়েই আসছেন তাই তারা এখানে কাউকে গান্ধীজির সভার আয়োজন করতে দেবে না।

তারা যখন আমাদের গ্রামে ঢুকতেই দিচ্ছিল না তখন আমরা

ওখানেই ধর্ণা দিয়ে বসে পড়ি। গান্ধীজি এসে পৌঁছুবার কয়েক ঘন্টা আগে সেশা রেড্ডি এসে দলবল নিয়ে হাজির হলেন। তার একটা বড় গোষ্ঠী ছিল, খুব ক্ষমতাশালী জমিদার ছিলেন তিনি। তার আসার আগে বিরোধীরা আমাদের কোন পাত্তা দিচ্ছিল না। ওরা ভাবছিল আমরা তো বাইরের লোক, স্থানীয়দের মধ্যে আমাদের কোন সমর্থক নেই। সেশা রেড্ডি সেখানে পৌঁছেই চিৎকার করে বিরোধীদের ওখান থেকে চলে যেতে আদেশ দিলেন। আমরা লোকজনদের সঙ্গে নিয়ে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছিলাম তাই খুব শৃঙ্খলাপূর্ণভাবে সভার কাজ সম্পন্ন হয়েছিল। কোন অপ্রীতিকর ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়নি তাই স্বেচ্ছাসেবকদের নেতা হিসেবে তার সফল কৃতিত্ব আমাকেই দিল। সেশা রেড্ডিও আমার খুব প্রশংসা করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে একবার নগর পঞ্চায়েত নির্বাচনে আমি তাঁকে পরাজিত করেছিলাম। তিনি এখনও জীবিত আছেন (লেখাটা লেখা পর্যন্ত)। দীর্ঘদিনের সম্পর্ক তাঁর সঙ্গে আমার। দেখা হলে দুজনে প্রায়ই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের দিনগুলির স্মৃতিচারণ করতাম।

একই রকম ঘটনা ঘটেছিল ১৯৩৫ সালে যখন নেহরু একটি জনসভাতে বক্তব্য রাখার জন্য মাদ্রাজ এসেছিলেন। আমাদের ছাত্র দলের সাহায্যে সভার ব্যবস্থাপনা তদারক করার জন্য স্থানীয় কংগ্রেস নেতারা আমাকে অনুরোধ করেছিলেন। বস্তুতঃ নেহরু রেল স্টেশনের পৌঁছুবামাত্র হঠাৎ মানুষজন ছুটোছুটি করে এমন একটা ছত্রভঙ্গ অবস্থা তৈরি করেছিল যে তাঁকে স্টেশন থেকে বের করে আনাই একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পরের দিনের জনসভা নিয়ে নেতারা তাই আশঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন। লঙ্কা বলে একজন আইনজীবী, যিনি একজন কংগ্রেস নেতাও বটে, পর্যাপ্ত সংখ্যায় স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে সভার কাজ সুশৃংখলভাবে চালানো নিশ্চিত করতে আমাকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। আমি আমার দলের সকলকে একত্রিত করি, রামও অনেক ছাত্র নিয়ে এলো। দুদল মিলে প্রায় ২০০ জনের মত স্বেচ্ছাসেবক জোগাড় হয়ে গেলো। নেহরুজি যাতে নিরাপদে

মঞ্চে পৌঁছুতে পারেন এবং সভা শেষ হলে আবার গাড়িতে ফিরে যেতে পারেন তার জন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থার কোন ফাঁক বা ত্রুটি ছিলো না। সভাতে যারা এসেছিলেন তাদের প্রত্যেককে বসে পড়তে বলি আমরা। কেউ যাতে সামনে দাঁড়িয়ে না পড়ে বা মাঝখানে হাটাহাটি না করে সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে বলি। অত্যন্ত শান্তি শৃঙ্খলার মধ্যে সভার কাজ সম্পন্ন হয়েছিলো। কোন হুড়োহুড়ি নয়, সকলেই স্বচ্ছন্দে সভাস্থল থেকে বেরিয়ে যেতে সমর্থ হয়েছিলেন। সবদিক দিয়ে সভাটি খুব সফল হয়েছিলো। নেতারাও খুব খুশি হয়েছিলেন এবং আমাদের প্রচেষ্টার খুব প্রশংসা করেছিলেন। দু'দিনের ব্যবস্থাপনার মধ্যে পার্থক্য সংবাদ মাধ্যমেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলো। পত্রিকার খবর ছিলো গতকাল নেহরুজি রেলস্টেশনে পৌঁছুবার পর যে ধরনের অব্যবস্থা ও বিশৃঙ্খলা হয়েছিলো, আজকের সভা ছিলো তুলনামূলক অনেক শৃঙ্খলাপূর্ণ ও সংগঠিত। একদল ছাত্র, ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী এবং সংবাদ মাধ্যমের কর্মীদের জন্যই এটা সম্ভব হয়েছে বলে খবরে উল্লেখিত হয়েছিলো। ততদিনে একনিষ্ঠ কমিউনিস্ট সমর্থক হিসাবে আমরা পরিচিত হয়ে উঠেছিলাম। তথাপি শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারসহ সকল কংগ্রেস নেতৃত্ব এবং সাধারণ মানুষ আমাদের কাজের খুব প্রশংসা করেছিলেন। পি রামমূর্ত্তি সেদিন স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে ছিলেন কিনা আমি ঠিক মনে করতে পারছি না। এ সমস্ত অভিজ্ঞতা থেকে এ ধরনের জনসভার ব্যবস্থাপনা দেখাশুনার জন্য স্বেচ্ছাসেবক দল গঠনের উপর আমি খুব গুরুত্ব দিতে শুরু করি।

আমার মনে পড়ে ১৯২৯ সালে গান্ধীজি যখন পাল্লেপদু (Pallepadu) আশ্রমটি পরিদর্শনে আসেন, তখন কংগ্রেস নেতারা আমাদের অনুরোধ করেছিলেন গান্ধীজি ওখানে থাকার সময়ে সমস্ত ব্যবস্থার দেখভাল করার জন্য। আশ্রমটি এখন ধ্বংসের পথে। আমি পশুপতি নরসীমা রাজু ও আরও কয়েকজনকে পাঠিয়েছিলাম দখলদারদের হাত থেকে আশ্রমটিকে রক্ষা করার জন্য। গ্রামের মনসুব (Munsub),

নায়েব সকলে আশ্রমের জমিটি টুকরো টুকরো করে গ্রাস করে নিতে চাইছিলো। আমরা যে কোন মূল্যে তা বন্ধ করতে চেষ্টা করি। তাই আমি প্রায়ই আশ্রমে গিয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে শুরু করলাম। আশ্রমের সীমানার ভেতরে একটা বড় কুয়া ছিলো। আমরা এর জলকে কাজে লাগাতে চাইলাম। উত্তোলক বা পাম্প দিয়ে জল তুলে আশ্রমের পতিত জমির মধ্যে খাল কেটে ঐ জলে সেচের ব্যবস্থা করলাম। আশ্রমের চারধার বেড়া দিয়ে ঘিরে দিলাম। একদিন স্থানীয় এক জমিদার তার গরুগুলিকে আশ্রমের শষ্য ক্ষেতের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলো। আমরা সবগুলো পাশের গ্রামের খোয়াড়ে দিয়ে এলাম। গ্রামের কোন খোয়াড় মালিকের খোয়াড়ে দিলে জমিদারের কথায় গরুগুলিকে ছেড়ে দিতো। এবার জমিদার অন্য গ্রামে গিয়ে গরুগুলি ছেড়ে দিতে বললে খোয়াড় মালিক জানাল যে আমার অনুমতি ছাড়া সে গরু দিতে পারবে না। জমিদারের লোকজন বোঝাতে চাইলো আমরা জমিদারের কথা শুনবো না। কিন্তু খোয়াড়ের মালিক তার কথাতেই অনড় রইলো। অবশেষে জমিদার বাধ্য হলেন আমাদের সঙ্গে দেখা করতে। আমরা বললাম প্রথমে তাকে তার কুকর্মের জন্য ক্ষমা চাইতে হবে এবং ভবিষ্যতে আর কখনো আশ্রমের জমি দখল করবে না বলে মুচলেকা দিতে হবে। এভাবেই আমরা চিরতরে এই সমস্যার সমাধান করতে পেরেছিলাম।

গ্রামের ক্ষেতমজুরদের আন্দোলন সংগঠন গড়ে তোলার মধ্য দিয়েই আমরা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলাম। আমাদের শক্তিও বৃদ্ধি পেয়েছিলো। গ্রামের জমিদাররা প্রথম থেকেই আমাদের এসব কাজের প্রবল বিরোধী ছিল। আমাদের দাবি ছিলো ফার্ম শ্রমিকদের উপযুক্ত ও ন্যায্য মজুরি, তাদের অধিকারের স্বীকৃতি ও মর্যাদা। জমিদারদের কথা ছিল এখন উঁচুহারে মজুরি চাইছে, ভবিষ্যতে তো জমির ভাগও চাইতে পারে। এটা সত্য যে, পরে আমরা জমির ভাগ চেয়েছিলাম। জমিদাররা আমাদের লড়াই আন্দোলন বন্ধ করে দেবার জন্য তৎপর হয়ে উঠলো। মজুরি বৃদ্ধির বিরুদ্ধে

তারা বহু যুক্তি খাড়া করলো। আমি তাদের হিসেব কষে দেখিয়ে দিলাম মজুরি বৃদ্ধির ফলে তারা যে লাভ বা মুনাফা করছে তার খুব একটা ইতরবিশেষ হবে না। কুয়োর জল নিয়েও হরিজন ও গ্রামের জমিদারদের মধ্যে এ ধরনের বিরোধ সংঘাত লেগেই ছিলো। আমি দুপক্ষের সঙ্গে অনেক আলাপ আলোচনা করে কোন পক্ষই কুয়া থেকে জল নেওয়ার ব্যাপারে কোন ওজর আপত্তি করবে না বা কেউ কাউকে বাধা দেবে না বলে রাজি করাতে পেরেছিলাম। এর ফলে গ্রামের অস্পৃশ্যতার ব্যাপারটা সামান্য হ্রাস পেয়েছিলো। আমাদের দলে সমস্ত শ্রেণির এবং সমস্ত অংশের লোক ছিলো ফলে আমাদের পেছনে একটা বিরাট জনসমর্থন ছিলো।

গ্রামের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষদের মধ্যে একটা ঐক্য সংহতির বাতাবরণ তৈরি করার জন্য আমরা হরিজন বা পেছনেপড়া অংশের মানুষের যেখানে বসবাস সেখানকার কুয়া থেকে জল আনতে শুরু করি। পাশাপাশি মানুষের জলের অধিকার সম্পর্কে সজাগ সচেতন করতে থাকি। গ্রাম থেকে প্রায় আধমাইল দূরে যে কুয়া আছে প্রথমে আমরা সেখান থেকে জল সংগ্রহ করলাম। দ্বিতীয় দিনে আমরা প্রধানত গ্রামের ধনাঢ্য রেড্ডিরা যেখানে বসবাস করে সেখান থেকে জল নিয়ে এলাম। তৃতীয়দিন জল আনলাম তাঁতীপাড়া থেকে। এবং চতুর্থ দিন আমরা গ্রামের উত্তর পূর্ব প্রান্ত যেখানে গ্রামের সবচেয়ে গরিব আর দুর্বল অংশের মানুষরা বাস করে সেখান থেকে জল সংগ্রহ করে নিয়ে আসি। উঁচু জাতের মানুষরা তাদের কুয়া থেকে জল আনতে কোন আপত্তি না করলেও, একে অন্যের কুয়া থেকে জল আনার জন্য আমাদের যে আহ্বান ছিলো তাতে সাড়া দেয়নি। প্রথমে তো ওরা চাইছিলো আমাকে বা আমাদের দলের লোকজনদের আক্রমণ করতে, মারধোর করতে। কিন্তু বিষয়টা যে হরিজনরা নীরবে মেনে নেবে না, প্রত্যাঘাত করবে তা বুঝতে পেরে ভয়ে ভয়ে সে ইচ্ছা মনের মধ্যেই চেপে রাখতে হয়। তবে নানা অন্তর্ঘাত করে ঐক্য সংহতি গড়ে তোলার প্রয়াসকে পদে পদে ব্যর্থ করতে, নস্যাৎ

করতে চেষ্টা করেছিলো। যেমন একদিন রাতের বেলায় পানীয় জলের কুয়ার মধ্যে পায়খানার নর্দমার ময়লা ফেলে দিলো। আমাদের ছেলেরা সে রাতেই কুয়াটাকে ভালো করে পরিষ্কার করে ফেললো। তাদের এই অমানবিক ঘৃণ্য আচরণে আমাদের প্রচণ্ড রাগ হলেও আমরা কোনভাবেই এই ইসুট্যাকে বড় করে তুলতে দিইনি। তাই বিষয়টা চুপচাপ মিটে যায়। এবং পানীয় জলের অধিকারের জন্য আমাদের যে অভিযান তা সফল হয়ে উঠে। মানুষের মনের মধ্যে এই অধিকারবোধ প্রোথিত করতে সমর্থ হয়েছিলাম। তবে দুর্ভাগ্যের হলেও সত্য যে হরিজনরা যেমন ধনী জমিদারদের অঞ্চলের কুয়া থেকে জল আনতে প্রস্তুত ছিলো না, তেমনি জমিদার পরিবারের কোন সদস্যও উত্তর পূর্ব প্রান্তে যেখানে অন্তজরা বাস করেন সেখানকার কুয়ার জল কখনো ব্যবহার করতো না।

গ্রামে আমরা গরিব মানুষদের জন্য যে কর্মসূচী নিয়ে এগিয়ে চলেছিলাম, বিশেষ করে ক্ষেতমজুরদের সংগঠিত করার যে কাজটি আমরা ধারাবাহিকভাবে করে চলেছিলাম তা আশেপাশের সমস্ত গ্রামের মানুষের মনে দাগ কেটেছিল, তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। অন্যান্য গ্রামের অনেক ফার্ম-শ্রমিক, প্রান্তিক চাষী নিজেরা নিজেদের সংগঠিত করে আমাদের পতাকাতলে শামিল হচ্ছিলেন। তারা এমন একটা মঞ্চ গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিলেন যে মঞ্চ থেকে তারা তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক শোষণ বঞ্চনার বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতে পারেন। মজুরি বৃদ্ধির দাবিটিকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে তারা ধনী জমিদারদের শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। আমি সত্যাগ্রহ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু তাকে ছাপিয়ে গিয়ে খেতমজুর, ফার্ম-শ্রমিকদের যেভাবে আমি নেতৃত্ব দিয়ে চলেছিলাম তাতে সমগ্র নেল্লোরে আমার সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। এই আন্দোলনের সংগঠক হিসাবে আমি একটি মর্যাদার আসন লাভ করি। তৎকালীন কংগ্রেস নেতৃত্ব এটা অনুধাবন করতে পেরেছিল যে আমি একজন পরিশ্রমী সংগঠক এবং যে কোন সংগঠন

সংগ্রামের পক্ষে আমি একটা দামি সম্পদ। আমরা যখন বিশাল প্রেক্ষাপটে আমাদের কর্মসূচী নিয়ে এগিয়ে চলেছিলাম তখন ডুব্বরী বলরামী রেড্ডি-সহ সমস্ত বিপ্লবী নেতা যারা ব্যক্তিগত উদ্যোগে বিপ্লব করতে চাইছিলেন তারা গ্রেপ্তার হয়ে গেলেন। বিচারে তাদের জেল হয়েছিল। এখানে একজন হরিজন কমরেডের নাম অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে; তিনি গোদাবরী জেলার কমঃ চোল্লাবিষ্ণু। যে দু'বছর আমি আলগনিপড়ুতে ছিলাম তিনি ছিলেন আমার সকল সাংগঠনিক কাজের সর্বক্ষণের সঙ্গী। অন্য কাজে যোগ দেবার জন্য আলগনিপড়ু ছেড়ে আসার দিনটি পর্যন্ত আমার পাশে থেকে আমাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন এই কমরেড।

সুন্দরাইয়ার বিপ্লবী জীবনের কয়েকটি দিক

লীলা সুন্দরাইয়া

১৯৪২ সালে পার্টিতে যোগ দেবার আগে পর্যন্ত ব্যক্তি হিসাবে পি সুন্দরাইয়া সম্বন্ধে আমার খুব বেশি জানা ছিল না। পার্টির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠে যাবার পর বোম্বাইয়ের রাজভবন বিল্ডিঙে খোলা হয়েছিল পার্টির সদর দপ্তর। অফিস চালাবার জন্য তখন কমরেড খোঁজা চলছিল। সেইমতো কমরেড পি সি যোশীর নির্দেশে (তিনি তখন সাধারণ সম্পাদক) পি এস আমায় কেন্দ্রীয় অফিসে যোগ দিতে বললেন। তখন আমি ব্যাঙ্কে কাজ করছিলাম। তখনকার দিনে ব্যাঙ্কে না ছিল কোনো ইউনিয়ন, না ছিল কোনো নিয়মিত পদোন্নতির ব্যবস্থা। এসবই নির্ভর করতো উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের ইচ্ছা অনিচ্ছার ওপর। ৯ বছর চাকরি করার পর আমার মাইনে পৌঁছেছিল ১৫০ টাকায়। অবশ্য তখনকার দিনে এই মাইনেই ছিল আমার প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট। পরবর্তীকালে চাকরির শর্ত যখন পাল্টালো এবং চাকরিতে থাকলে আমি হাজার-বার শো টাকা পেতে পারতাম, এই চাকরি আমায় ছাড়তে বলেছিলেন বলে পি এস দুঃখ করেছিলেন। কেননা পার্টি তখন সবে আইনিভাবে কাজ করতে পারছে, সেই মুহূর্তে চলেছে পার্টির নিদারুণ অর্থ সংকট। পি এস তখন বলতেন চাকুরিতে যদি আমি থাকতাম তবে দু'জন সর্বক্ষণের কর্মী রাখার ব্যাপারে সাহায্য করতে পারতাম । চিরকালই তিনি মনে করতেন পার্টিকে সংগঠিত করতেও জনগণের কাছে পার্টিনীতি নিয়ে যাবার জন্য সর্বক্ষণের কর্মীদের কাজ সবচেয়ে জরুরি।

তখন থেকেই পার্টির সদর দপ্তরে ক্যাশিয়ার হিসাবে আমি কাজ শুরু করেছিলাম। ক্যাশিয়ারের কাজ খুব বেশি না থাকায় অফিসের অন্যান্য কাজে কমরেডদের সাহায্যও করতে হতো। সে সময়ে মাঝে মধ্যেই পি

এস অন্ধ্রে যেতেন, আবার বোম্বাইয়ে ফিরে আসতেন। তারপর এল ১৯৪৩ সালের প্রথম পার্টি কংগ্রেস। কংগ্রেসের জন্য দলিল তৈরির কাজে নেতৃস্থানীয় কমরেডরা সবাই ব্যস্ত থাকতেন। অফিসের কমরেডদের তা টাইপ ও সাইক্লো করে দিতে হতো। অফিসের কমরেডদের সঙ্গে আমাকেও তা করতে হতো।

একদিন গভীর রাত পর্যন্ত পি এস তাঁর লেখা নিয়ে ছিলেন ব্যস্ত। তিনি দেখতে পান আমিও সর্বক্ষণ সাইক্লো মেসিনে কাজ করে যাচ্ছি। এ থেকে আমাকে এক সাচ্চা ও পরিশ্রমী কমরেড বলে তাঁর ধারণা হয়েছিল। আমাদের বিয়ের পর এ কথা তিনি আমাকে বলতেন।

আগেও পার্টির বে-আইনি যুগে পি এস- কে আমি দেখেছিলাম। আমাদের বাড়িটা ছিল গোপন পার্টির এক যোগাযোগ কেন্দ্র। মাঝে মধ্যে তিনি সেখানেও আসতেন। তাঁর সুঠাম স্বাস্থ্য, সরল জীবনযাপন এবং তাঁর সম্বন্ধে যে সব কাহিনি শুনেছিলাম তাতে তার প্রতি আমি আকৃষ্ট হয়েছিলাম। তাই পরবর্তীকালে ১৯৪৩ সালে তিনি যখন বিয়ের প্রস্তাব দিলেন তা মেনে নিতে আমার এতটুকুও দ্বিধা ছিল না।

বিয়ের পর অবশ্য তাঁকে আমি আরও অনেক বেশি বুঝতে পেরেছি। তাঁর অভ্যাস ছিল সাদাসিধে, শৃঙ্খলায় কঠিন, নিজের স্বাস্থ্য স্বাভাবিক রাখার জন্য প্রত্যহ প্রাতঃকালীন ব্যায়াম (তিনি নিয়মিত যোগাসন করতেন), ব্যবহার করতেন মোটা খাদির হাফ-শার্ট ও হাফ্ প্যান্ট — এগুলি হলো তাঁর বিশেষত্ব। রোজই তিনি তাঁর নিজের প্যান্ট জামা কাচতেন। দিনের বেলা এক মিনিটের জন্য কখনো খোশগল্প করে সময় নষ্ট করেন নি। আড্ডা মারা তাঁর ধাতে সইত না। সহকর্মীদের সঙ্গে সব সময়ই কথাবার্তা হতো রাজনৈতিক। কংগ্রেস সত্যাগ্রহী ক্যাম্প থেকে এসেছিলেন বলে চা কফিতে তাঁর কোনো নেশা ছিল না। দিনে মাত্র দু'বার করে পেট ভরে খেতেন। এটাই ছিল তাঁর অভ্যাস। আমরা ৫০/৬০ জন কমরেড তখন পার্টির সদর দপ্তরে থাকতাম। একই কমিউনে খেতাম। আমার মা এই কমিউন চালাতেন। সেখানে খাবার ব্যাপারে

পি এস-এর বিশেষত্ব ছিল। প্রথম ব্যাচে খাওয়া শুরু করে শেষ করতেন দ্বিতীয় ব্যাচে। আমাদের বিয়ের আগেও আমার মা তাঁকে খুব পছন্দ করতেন আর তাই তাঁকে পরিবেশনের সময় দই বেশি দিতে চাইতেন। প্রত্যেকের এক কাপ করে বরাদ্দ বলে বেশি দই তিনি নিতে চাইতেন না। পরবর্তীকালে সংসদের সভা থাকাকালে অবশ্য বাধ্য হয়ে সকালের জলখাবার খেয়েই তাঁকে সংসদে যেতে হতো; দুপুরের পর তিনি বাড়ি এসে মধ্যাহ্নভোজ করতেন।

আমরা কলকাতায় আসার পর তিনি দেখলেন, সেখানকার কমরেডরা খুব চা খান। যেখানেই যান সেখানেই তাঁকে চা খেতে বলা হয়। চা তিনি না খেতে চাইলে কমরেডরা দুধ বা ঘোল আনতে ছোটেন। এ ব্যাপার তাঁকে খুবই বিচলিত করে তুলত। তাঁর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করতে কমরেডরা কষ্ট বা অসুবিধায় পড়ুন এটা তিনি কখনোই চাইতেন না। তিনি তাই চা খাওয়া অভ্যাস করে নিলেন। চা পানে ও তা তৈরি করতেও দক্ষ হয়ে উঠলেন। সকাল সাড়ে চারটে থেকে পাঁচটার মধ্যে ঘুম থেকে উঠে পড়াশুনা করা ছিল তাঁর নিয়মিত অভ্যাস। তারপর ব্যায়াম সেরে নিজে চা তৈরি করতেন ও তারপর আমায় ঘুম থেকে ডাকতেন। যতদিন না পর্যন্ত ডাক্তাররা তাঁকে পানীয় খেতে নিষেধ করেছেন, সেই শেষের এক বছর ছাড়া অসুস্থ অবস্থাতেও এই অভ্যাস তাঁর ছিল।

আমাদের কমিউনে রান্নার লোকেরাই খাবার বানাতেন। তবে এক এক সময়ে এক এক জন কমরেডের ওপর পরিবেশনের ভার থাকত। নেতা হিসেবে অন্য সব কমরেডদের উঁচুতে বলে নিজেকে কোনো দিন মনে করেননি পি এস। নিজেও তাই পালাক্রমে এই পরিবেশনের দায়িত্ব নিতেন। কেউ কমিউনের শৃঙ্খলা ভঙ্গ করলে তিনি রেগে যেতেন। সত্যি সত্যিই আগে তিনি ছিলেন রাগী লোক। আমি কিন্তু প্রশংসা পেতে পারি যে, আমাদের বিয়ের পর তিনি এমন শান্ত হয়ে যান যে প্রত্যেকেই তাঁকে এক মিষ্টভাষী

বিনম্র কমরেড বলতেন।

পার্টি সদর দপ্তর থেকে আমাদের পার্টি পত্রিকা 'পিপলস ওয়ার' বার হতো। পত্রিকাটি ছাপা হতো পাশের এক গলিতে পার্টির নিজস্ব ছাপাখানায়। কমিউনিস্ট বিরোধী বিদ্বেষ তখন প্রবলভাবে চলছে। একদিন রাত্রে একজন লোক ছাপাখানায় বিস্ফোরক ছুরে মারে। তাতে অবশ্য ছাপার মেসিনের খুব বেশি ক্ষতি করতে পারেনি। তবুও পরের দিন থেকেই কিছুদিনের জন্য প্রতিদিন রাতে দু'জন করে কমরেডকে ছাপাখানা পাহারা দেবার জন্য ডিউটিতে রাখার ব্যবস্থা করা হলো। একদিন পি এস-ও এই ডিউটি নিলেন। আমি তাঁর সঙ্গে রইলাম। সেই রাত্রে আমরা দু'জনে ছাপাখানা পাহারায় থাকলাম। তিনি কখনো পুরুষ ও মহিলাদের কাজের মধ্যে পার্থক্য টানেননি।

স্থায়ীভাবে আমাদের অন্ধ্রে চলে আসার সময়ে পার্টির সদর দপ্তরে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আমাদের বিদায়কালে এই সভায় কমরেড বি টি আর তাঁর ভাষণে পি এস- কে বলেছিলেন, " আমরা মারাঠিরা আমাদের দুই কন্যা কৃষ্ণা ও গোদাবরীকে ইতিমধ্যেই তোমাদের দিয়ে দিয়েছি। আর আজ আমরা দিয়ে দিচ্ছি আমাদের তৃতীয় কন্যাকে। আমাদের আশা, প্রথমোক্ত দুই কন্যার মতো এও তোমাদের শ্রীবৃদ্ধি এনে দেবে। ভালভাবে তার প্রতি লক্ষ্য রেখো।" তারপর পি এস আমাকে অন্ধ্রে নিয়ে আসলেন। এখানে এসে আমি এক কঠিন সমস্যায় পড়লাম। পি এস অফিসেই থাকতে লাগলেন ও সেখান থেকেই কাজ করতে লাগলেন। তিনি বুঝতে পারছিলেন না কেন আমি তাঁর মতো করে কাজ করতে পারছি না। কষ্টকর অবস্থার মধ্যে সেখানে থাকার অসুবিধার কথা তাঁকে বুঝিয়ে বলতে হলো। পরে পার্টি বেজোয়াড়ার কমরেডদের জন্যে যে কুটির তৈরি করেছিল, তারই একটিতে আমরা উঠে এলাম। সেখানেও আমাদের একটি কমিউন ছিল। যদিও এই কুটিরে এসে থাকতে রাজি হয়েছিলেন পি এস, তিনি আমায়

রান্নাবান্না না করে কমিউনের জন্য কমরেডদের সঙ্গে একত্রে খাবার জন্য পীড়াপীড়ি করলেন। অন্ধ্রের লোকেরা তণ্ডুলভোগী। আর মারাঠি হিসেবে আমি ছিলাম রুটি আর সামান্য ভাত খেতে অভ্যস্ত। আমার ক্ষিধে থাকত সবসময়। কিন্তু শৃঙ্খলাকে মেনে নিয়ে ধৈর্য ধরে আমি তা সহ্য করে যেতাম।

তখন ১৯৪৬ সাল। সন্ধ্যাবেলায় একদিন যখন অফিসে কাজ করছিলাম, জানালা দিয়ে দেখলাম কয়েকটি জিপ অফিসের দিকে আসছে। তখন সেই এলাকায় বিশেষ লোকবসতি ছিল না। এই ধরনের এক সঙ্গে কতকগুলি জিপ আসাটা ছিল অস্বাভাবিক ঘটনা। কোনো কিছু ঘটার আশঙ্কায় আমাদের সম্পাদকীয় অফিসে পি এস-এর কাছে ছুটে গিয়ে তাঁকে খবরটা দিলাম। আমার চেয়ারে ফিরে আসার প্রায় সাথে সাথেই পুলিস দ্রুত অফিসে ঢুকে তন্নতন্ন করে সার্চ করতে শুরু করে দিল। পি এস- কে কিন্তু খুঁজে পেল না কোথাও। ইতোমধ্যে তিনি পালিয়ে গিয়েছেন। এলাকার ভৌগোলিক অবস্থা তাঁর জানা ছিল, সমস্ত গলি ঘুঁজি ছিল নখদর্পণে। তাই তিনি পুলিশের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারলেন। গোপনে থাকার জন্য এটি ছিল তাঁর অনুশীলনের অঙ্গ।পার্টি আইনি থাকার সময়ও তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে, আইনি ব্যাপারটা স্থায়ী কিছু নয়। তাই কখনো তিনি গোপনে থাকার অভ্যাস ছেড়ে দেননি।

তারপর এল তেলেঙ্গানার লড়াই। আমিও অন্য এক মহিলার সঙ্গে তখন গোপন কেন্দ্রে থাকতাম। এই গোপন কেন্দ্রটি যিনি দেখতেন, ভদ্রমহিলা ছিলেন সেই কমরেডের মা। পি এস মাঝে মাঝে কিছু দিনের জন্যে বাইরে জঙ্গল এলাকায় চলে যেতেন, আবার অন্য কমরেডদের সঙ্গে আলোচনা করার জন্য ফিরে আসতেন। অত্যন্ত কঠিন সময় ছিল তখন। পুলিশ যে কোনো কমরেডকে ধরতে পারলে গুলি করে হত্যা করতো। একটি ব্যাপারে আমি আশ্বস্ত ছিলাম যে, পি এস- কে সকলে খুব বেশি চেনে না। এমনকি পুলিসও না। তা সত্ত্বেও জঙ্গল এলাকা থেকে আসা

কোনো লোককে সন্দেহ করলে কোনো তদন্ত বা মামলা ছাড়াই তাঁকে গুলি করে হত্যা করার সম্ভাবনা ছিল। সে সময় যখনই তিনি বাড়ি ছেড়ে যেতেন,আমায় নির্দিষ্ট দিন ও সময় বলে যেতেন কখন তিনি ফিরবেন। সময় সম্পর্কে তিনি এতই সতর্ক ছিলেন যে, ফিরে আসার যে সময় তিনি দিতেন তার থেকে ১ মিনিট দেরি হলে পরই গোপন কেন্দ্রে থাকা অন্য কমরেডদের নিরাপত্তার জন্য আমার করণীয় সম্বন্ধে আমি চিন্তায় পড়তাম। যেহেতু তিনি কঠোরভাবে সময় মেনে চলতেন এবং তাঁর প্রতিটি কাজই ছিল পরিকল্পনামাফিক তাই এমন অবস্থা কখনো আসে নি। গোপন জীবন সম্বন্ধে পি এস- এর ছিল এক পৃথক দৃষ্টিভঙ্গী। তিনি গোপন কেন্দ্রে বিশ্বস্ত কিছু কমরেডকে রাখতেন। অন্য সব ব্যবস্থাই ছিল চমৎকার।

এক সন্ধ্যায় খবর এল মাঝের সংযোগকারী এক কর্মী গ্রেপ্তার হয়ে গেছেন। গ্রেপ্তারের অর্থই ছিল বর্বর অত্যাচার, তিনি তা সহ্য করতে না পারলে পার্টির গোপন ব্যবস্থাদি প্রকাশ হয়ে যেতে পারে। সেদিন আমাদের গোপন কেন্দ্রে কয়েকজন নেতৃস্থানীয় কমরেড ছিলেন। তাঁদের রক্ষা করাটাই হয়ে পড়ল তাঁর প্রধান কাজ। সে রাত্রে তিনি নিজে রাত দু'টো পর্যন্ত পাহারা দিলেন। তারপর আমাকে এই ডিউটি করতে জাগিয়ে দিলেন। একটি পিস্তল আমাকে দিলেন। বললেন, পুলিশ হামলা হলে আত্মরক্ষা করবে। প্রতিরোধ করে শত্রুদের পিছনে হটিয়ে দিতে হবে যাতে অন্যেরা রক্ষা পায়। যোগাযোগকারী সেই ব্যক্তি আমাদের গোপন কেন্দ্র সম্বন্ধে কিছু জানতেন না বলে সৌভাগ্যক্রমে বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া গিয়েছিল।

পুরো পাঁচ বছরে গোপনে থেকে কাজ করার সময় আমি তাঁর সঙ্গে ছিলাম। পার্টিতে গোপনে থেকে কাজ করার জন্য যে আবশ্যিক নিয়মগুলি তিনি করেছিলেন অত্যন্ত কঠোর গোপনীয়তার সঙ্গে সেই বিধি তিনি নিজেও মেনে চলতেন। তাঁর কাজকর্মের কোনো কিছুই আমার কাছেও প্রকাশ করতেন না।

তেলেঙ্গানার সংগ্রাম প্রত্যাহার করে নেবার পর ১৯৫২ সালে পি এস সংসদের প্রথম রাজ্যসভায় নির্বাচিত হন। সেই সময় পার্টির সদর দপ্তর উঠে এসেছিল দিল্লিতে। সেখানকার সব বিষয় জানতে ও ব্যবস্থা করতে আমাদেরও সত্ত্বর সেখানে চলে যেতে হয়েছিল। সংসদের অধিবেশন শুরু হবার আগে পি এস পার্লামেন্টে কাজের বিষয় আলোচনা করার জন্য পার্টির সমস্ত সংসদ সদস্যের সভা ডাকলেন। সদ্য নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের দিল্লিতে আসার আগেই সমস্ত রাজ্যে তাঁদের কাছে নোটিস পাঠানো হলো। এতে কিছু কমরেড সংসদ সদস্যদের সভা ডাকার অধিকার সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলেছিলেন, নেতা হিসাবে তিনি এই সভা ডাকতে পারেন কি না। কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসাবে পি এস তখনকার সাধারণ সম্পাদক কমরেড অজয় ঘোষের অনুরোধেই এইসভা ডেকেছিলেন। ইংল্যান্ড প্রত্যাগত উচ্চ শিক্ষিত কমরেডরাই প্রশ্ন তুলেছিলেন। তাঁরা জানতেন, পি এস এমন কি কলেজ শিক্ষাও শেষ করতে পারেননি। পি এস এতে ভীষণ আহত হয়েছিলেন। ফলে সংসদের প্রথম দিনটি থেকেই দৃঢ় সংকল্প নিয়ে গভীরভাবে সকল বিষয়ে পড়াশুনার জন্য সমস্ত শক্তি নিয়োগ করলেন। তার যা অভ্যাস ওটা না হলেও তিনি তাই করতেন। সংসদে যে বিষয় বির্তক আসছে সেই সম্বন্ধে রোজই তিনি গভীর রাত পর্যন্ত পড়াশুনা করতেন এবং ভোর বেলায় ঘুম থেকে উঠেও সেই বিষয়ে পড়াশুনায় বসতেন।

সকল সংসদ সদস্যের তিনি বাসস্থানের ব্যবস্থা করেছিলেন, সংসদীয় অফিস সংগঠিত করেছিলেন, পার্লামেন্টের বিষয়গুলি বুঝে সংসদ সদস্যদের বক্তব্যের খোরাক যোগাতে পারবেন বিভিন্ন রাজ্যের এমন অনেক কমরেডকে পার্টির সংসদীয় অফিসে আনিয়ে নিয়েছিলেন এবং নিজে সংসদীয় কাজের প্রতিটি ব্যাপারে পার্টির কর্তব্য ও নীতি তাঁদের বুঝিয়ে দিতেন। নিজের কাজ সম্বন্ধে গভীর অনুশীলন ও নিষ্ঠা এবং বিষয় সম্বন্ধে দ্রুত উপলব্ধির ক্ষমতা রাজ্যসভায় তাঁকে বিশিষ্ট করে তুলেছিল। রাজ্যসভায়

তখনকার চেয়ারম্যান ড: রাধাকৃষ্ণণ কারো সঙ্গে যখনই আলোচনা করেছেন তখনই তিনি সুন্দরাইয়ার প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করতেন।

স্বাধীনতার পর এটিই ছিল প্রথম সংসদ। তাই মন্ত্রীরাও তাঁদের কাজে ছিলেন একেবারে নবাগত। তাঁদের দুর্বলতার কথা পি এস জানতেন। তথাপি, বিরোধী দলে থেকেও তিনি কখনো তাঁদের এই দুর্বলতাকে নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করেন নি। সব সময়ে তিনি চাইতেন সংসদের শালীনতা বজায় থাকুক। যোগ্য মন্ত্রীদের তিনি আন্তরিকভাবে প্রশংসা করতেন। তখনকার অর্থমন্ত্রী সি ডি দেশমুখ ছিলেন এই মন্ত্রীদের অন্যতম। পি এস বলতেন, দেশমুখকে কখনো সংখ্যাতত্ত্ব দিয়ে বেকায়দায় ফেলা যাবে না। শোনা যায় অনেক মন্ত্রীই নাকি তাঁদের দপ্তরের সচিবদের নির্দেশ দিয়েছিলেন তাঁরা যেন পি এস - এর ভুল সম্বন্ধে একেবারে নিশ্চিত না হয়ে তাঁর বক্তব্যের প্রতিবাদ না করেন। এই নির্দেশ দেবার কারণ হলো, পি এস-এর প্রবল স্মরণশক্তি, বিস্তৃত সংখ্যাতত্ত্ব এবং সমস্ত তথ্যই থাকতো তাঁর হাতের কাছে মজুত।

একদিনের কথা। রাজ্যসভার এক ঘটনা। কোনো এক ব্যাপারে সুন্দরাইয়ার সঙ্গে জওহরলালের দারুণ বির্তক বেধেছিলো। পি এস যখন দুপুরে খেতে বাড়ি এলেন তখনও তিনি ছিলেন ক্রুদ্ধ। সেই ঘটনার কথা তিনি আমায় বললেন। সংসদীয় প্রথা হলো, প্রধানমন্ত্রী সমস্ত সংসদ সদস্যদের বছরে একদিন নিমন্ত্রণ করে আপ্যায়ন করে থাকেন। সেই দিনটিই ছিল প্রধানমন্ত্রীর এই অ্যাপায়নের দিন। এই অনুষ্ঠানে সাধারণত আমিও নিমন্ত্রিত হতাম। অনুষ্ঠানের সময় হয়ে আসছে। অথচ পি এস -এর মেজাজ বুঝে উঠতে পারছিলাম না, তিনি যাবেন কি না। শেষ পর্যন্ত তিনি আমাকে প্রস্তুত হতে বললেন, কিন্তু নিজের পোশাক বদল করতে চাইলেন না। তারপর আমরা বেরিয়ে পড়লাম।

জওহরলাল কিভাবে আমাদের গ্রহণ করবেন বুঝতে না পেরে আমার

গোটা পথটা বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করছিল। আমরা পৌঁছে দেখলাম প্রধানমন্ত্রী প্রবেশ পথে অতিথিদের স্বাগত জানাতে দাঁড়িয়ে আছেন। পি এস - কে দেখামাত্র তিনি বললেন, " এই যে সুন্দরাইয়া এসেছেন। সংসদ কক্ষে আজ আমাদের দারুণ বাক্‌যুদ্ধ হয়েছে, এবার দৈহিক যুদ্ধের পালা" — একথা বলেই তাঁকে ধরে জওহরলাল বুকে জড়িয়ে ধরলেন। পাশে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য দেখে আনন্দাশ্রুতে আমার চোখ আপ্লুত হয়ে গিয়েছিল। মনে হয়েছিল, সর্বদা বিরোধিতা করলেও দেশের শাসক পার্টির সর্বোচ্চ ক্ষমতাবান ব্যক্তির কাছেও পি এস-এর সম্মান কত গভীর। নিজের কাজের ওপর নিষ্ঠা, আত্ম-উদাসীন জীবন এবং সাদাসিধে আচরণের জন্য পি এস ছিলেন সবার কাছেই প্রিয়।

পরবর্তীকালে পি এস রাজ্য বিধানসভায় নির্বাচিত হয়ে আসেন এবং আমরাও হায়দ্রাবাদে চলে যাই। একদিন তাঁর বেজোয়াড়া থেকে ফেরার কথা ছিল। কিছু কাজ নিয়ে তিনি সেখানে গিয়েছিলেন। যখন ফিরলেন, মুখখানা একদম সাদা। দেখে মনে হচ্ছিল দেহের সমস্ত রক্ত বার হয়ে গেছে। জিজ্ঞাসা করে জানলাম, একটি গাড়ি করে তিনি যখন আসছিলেন তাঁদের সামনে এক মাল বোঝাই লরি হঠাৎ উল্টিয়ে নদীতে গিয়ে পড়ে। এক যুবক সেই লরির ওপর ঘুমাচ্ছিল। মাল বাঁধার দড়িতে পা জড়িয়ে গিয়ে সে লরির তলায় চাপা পড়ে যায়। এই দেখে পি এস নিজের গাড়ি থেকে নেমে সেই যুবককে উদ্ধার করতে জলে ঝাঁপিয়ে পড়েন। প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট চেষ্টা করার পর শেষ পর্যন্ত তিনি যুবকটির বুট জুতোর একটি মাত্র খুঁজে পেয়েছেন। এরপর সমস্ত আশা ছেড়ে দিয়ে তিনি বাড়ি চলে আসেন। দুর্ঘটনায় একটি যুবকের জীবন শেষ হয়ে যাবার দুঃখেই তিনি তৎক্ষণাৎ জলে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। পরে জানতে পারেন, সেই যুবকটি ছিল আমাদের পার্টির সেরা কারিগরী জ্ঞানসম্পন্ন কমরেডদেরই একজনের ভাই।

বিধানসভায় আসার পর তেলেঙ্গানা বন্দীদের বার করে আনার কাজে

পি এস ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তার আগেও দিল্লিতে থাকার সময় বন্দী কমরেডদের অনেকেই যখন সুপ্রিম কোর্টে তাঁদের হেবিয়াস কর্পাসের আবেদন নিয়ে আসতেন, পি এস- এর নির্দেশ ছিল, আমি যেন কোর্টে হাজির থাকি। তাঁদের সুবিধা অসুবিধাগুলির প্রতি নজর দেই এবং লক্ষ্য রাখি, যাতে অ্যাডভোকেটেরা যেন কেউ তাঁদের মামলার জন্য দাঁড়ান। বলতে ভাল লাগছে যে, কেবল আমার অনুরোধেই সেই সময়ে অনেক অ্যাডভোকেটই এই সব মামলায় সাহায্য করেছিলেন।

তখন অনেক কমরেডের দীর্ঘকালীন সশ্রম কারাদন্ডের আদেশ, কিছু কমরেডের যাবজ্জীবন কারাদন্ড ও কিছু কমরেডের ফাঁসির হুকুম হয়েছিল। কিছু কমরেড আবার ভারত রক্ষা আইনে আটক ছিলেন। তাঁদের মুক্ত করে আনতে পি এস যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন, প্রশাসনের দরজায় দরজায় ঘুরতেন, তাঁদের মুক্ত না করে আনা পর্যন্ত কখনো পিছু হটেননি। মৃত্যুদণ্ডের জন্য অপেক্ষারত শেষ কমরেডটির মুক্তি পাবার খবর যখন তাঁর কাছে এলো, তিনি বলেছিলেন : " আমার জীবনে সবচেয়ে সুখের মুহূর্ত এটি।" সমস্ত দরদ দিয়ে তিনি তাঁর সমস্ত কমরেডকে ভালবেসে গিয়েছেন। সব সময়েই তাঁর প্রধান চিন্তা ছিল কমরেডদের মঙ্গল।

তাঁর কর্মীদের সম্বন্ধে, বিশেষ করে সর্বক্ষণের কর্মীদের নিয়ে ছিল তাঁর উদ্বেগ। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, কমরেডরা যদি তাঁদের পারিবারিক আর্থিক দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হতে না পারেন তবে তাঁরা পার্টির কাজে পুরোপুরি মনঃসংযোগ করতে পারবেন না। সর্বক্ষণের কর্মীদের সম্বন্ধে তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নিতেন তাঁদের পোষ্যসংখ্যা কতজন, অন্য কোনো রোজগারে লোক পরিবারে আছে কি না, জমি আছে কি নেই অথবা অন্য কোনো অপ্রধান আয় ইত্যাদি বিষয়। পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে এ সব বিচার করেই তিনি সর্বক্ষণের কর্মীদের ভাতা নির্ধারণ করতেন।

তেলেঙ্গানা সংগ্রাম প্রত্যাহার করে নেবার পর গোপন অবস্থা থেকে

বার হয়ে এসে আমরা সোজা বেজোয়াড়ায় চলে আসি। এখানে এসে পি এস-এর প্রথম কাজ ছিল তেলেঙ্গানা সংগ্রামে জীবন দান করে যাঁরা শহীদ হয়েছিলেন— তাঁদের প্রত্যেক পরিবারের সঙ্গে দেখা করা। আমরা বেজোয়াড়া এবং সংলগ্ন সমস্ত এলাকার প্রতিটি শহীদ পরিবারের বাড়ি গিয়েছি। সেখানে গিয়ে শহীদের মা, বাবা , বোন, স্ত্রী বা ভাই, বাড়িতে যে কেউ থাকুন না কেন, তিনি তাঁদের সান্ত্বনা দিতেন। অনেক সময়েই সেখানে সান্ত্বনার কথা না শুনে বাড়ির লোকেদের সঙ্গে পি এস- এর কান্নার করুণ দৃশ্য দেখতে হতো। তবুও তাঁর এই দেখা সাক্ষাৎ এদের কিছুটা স্বস্তি দিত। কমরেডদের প্রতি তাঁর ভালবাসা এবং তাঁদের পারিবারিক মঙ্গলের জন্য আগ্রহ পি এস- কে কমরেডদের মধ্যে এবং সাধারণ জনগণের কাছে প্রিয় করে তুলেছিল।

দৈহিক অস্ত্রোপচারের জন্য ১৯৬৫ সালে তাঁকে মস্কো পাঠানো হয়েছিল। সঙ্গে আমি গেলেও আগেই আমাকে ফিরে আসতে হয়। অল্প কিছু দিন পরেই আমার চোখের রেটিনা ছিন্ন হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ি। হায়দ্রাবাদে এর উপযুক্ত চিকিৎসা হচ্ছিল না। ঠিকমতো দেখার কেউ না থাকায় চোখের অবস্থাও খারাপ হয়ে পড়েছিল। পি এস- এর মস্কো থেকে ফিরে আসার কথা থাকায় চিকিৎসার জন্য বোম্বাইতেও আমি যাই নি। কেননা তখন আমার সাহায্য তাঁর দরকার, এমন কি তিনি জেলে থাকলেও তা প্রয়োজন। দেশে ফিরে আসার সাথে সাথে যখন জেলে চলে গেলেন, সেখান থেকে আমায় লিখলেন: " আমি জানি চোখে রেটিনা ছিন্ন হবার অসুখে তুমি আক্রান্ত ও শয্যাশায়ী। এই অবস্থায় নিদারুণ অসুবিধা সত্ত্বেও তুমি পনের দিন অন্তর আমাকে দেখতে আসছ। অথচ আমি তোমার পাশে থাকতে পারছি না... আমি এখন জেলখানায় আটক বন্দী। প্যারোল আমি চাইতে পারি না, প্যারোল দেওয়া হলেও আমি তা নিতে পারব না। আমরা যারা নেতা, তাদের নিকট আত্মীয়ের অসুস্থতার জন্য প্যারোল চাই কিভাবে.. অন্যান্য সহকর্মীদের সামনে আমাদের অনেক উঁচু দৃষ্টান্ত ও আচরণ তুলে

ধরা দরকার। তা না হলে জেলখানার শৃঙ্খলা রক্ষা করা শক্ত হয়ে পড়বে। গত বছর কমরেড এম বি-র (এম বাসবপুন্নাইয়া) স্ত্রী যখন দারুণভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন কেরালা সরকার তখন তাঁকে প্যারোল দেয় নি। অন্ধ্র সরকারও প্যারোলে ছাড়তে দেরি করিয়ে দিয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে কমরেডদের নিকট আত্মীয় মারা যাবার পর প্যারোলের আদেশ এসে পৌঁছেছে। তাই আত্মমর্যাদা রক্ষার জন্য সিদ্ধান্ত করেছি, প্যারোলের জন্য আবেদন আমরা করব না।"

কারাগারে বন্দী থাকার সময়েও শ্রমিকশ্রেণির যে সব কমরেড জেলে ছিলেন তাদের জন্যও পি এস-এর ছিল উদ্বেগ। তিনি আমাকে বলেছিলেন, জেলে থাকা এইসব কমরেডের, যাদের জন্য কোন অর্থ সঙ্গতি নেই, তাঁদের পরিবারের প্রতি আমি যেন নজর রাখি। এই সব কমরেড জেল থেকে বেরিয়ে না আসা পর্যন্ত আমি এই কাজ করতে সক্ষম হয়েছি বলে আমি আশ্বস্ত।

অসুস্থ কমরেডদের প্রতি পি এস অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন এবং তাঁদের যথাযথ চিকিৎসার প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। এলাকায় চিকিৎসার সুযোগ না থাকলে তিনি সেই কমরেডকে নেল্লোরে পাঠিয়ে দিতেন। সেখানে তাঁর ভাই ডা: রাম হাসপাতালটি তৈরি করেছিলেন। ডা: রাম মারা যাবার পর অন্য ডাক্তাররা হাসপাতালটি চালাচ্ছেন। কেউ তাঁর নিজের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অবহেলা দেখালে পি এস তাঁকে তিরস্কার করে বলতেন, "স্বাস্থ্য যদি ভাল রাখতে না পারেন তা হলে পার্টির কাজ করতে হবে না।" নিয়মানুবর্তিতার অভ্যাসকে রপ্ত করে এবং নিয়মমতো ওষুধ খেয়ে নিজেও তিনি এ বিষয় মেনে চলতেন। না হলে মস্কোতে অতবড় অস্ত্রোপচারের পর তিনি এত বছর বেঁচে থাকতে পারতেন না। সেখানে অস্ত্রোপচার করে তাঁর শরীরের গোটা পাকস্থলীটাই কেটে বাদ দেওয়া হয়, পাকস্থলীর কাজ সম্পন্ন করতে হতো অন্ত্রের সাহায্যে। মস্কোর যে চিকিৎসক তাঁকে অস্ত্রোপচার করেছিলেন

তিনিও ১৯৮২ সালে তাঁকে দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন এই ভেবে যে, অস্ত্রোপচারের ১৭ বছর পরও তিনি তাঁর স্বাস্থ্য ভাল রেখে দিতে পেরেছেন।

যন্ত্রণা সহ্য করার অসীম ক্ষমতা ছিল পি এস-এর। কেবল একেবারে কাছাকাছি কেউ বা কোনো ভাল কমরেড মারা গেলে পরই তিনি ভেঙে পড়তেন। তা হলেও কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি আবার নিজেকে সামলে নিতেন। আমরা যখন কলকাতায় তখন তাঁর ভাই ডা: রাম মারা যাবার পর এ রকম ঘটনা ঘটেছিল। যে মানুষ কখনো একটি মুহূর্ত অপচয় করেন না, তাঁকে একদিন অস্বাভাবিকভাবে কিছু না করে এমন কি পড়াশুনায় না বসে শুয়ে থাকতে দেখলাম। গুমরে গুমরে তিনি কাঁদছিলেন। তাঁকে স্বাভাবিক করে তুলতে আমি তাঁকে সান্ত্বনা দিলাম, স্তোক দিলাম এবং এমন কি তিরষ্কার পর্যন্ত করলাম। পরে তিনি যখন বাইরে,আমাকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন " সেদিন যখন বিমর্ষ হয়ে আমি শুয়েছিলাম তুমি তখন উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলে। স্বাস্থ্যের কোনো গন্ডগোল তখন আমার ছিল না। যেভাবেই হোক, সেদিন আমি ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলাম এই ভেবে যে, রাম আর আমার সঙ্গে নেই। তুমি জানো, তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল কত গভীর। তার মৃত্যুর পর, এমন কি জীবনের স্বাদ আমার চলে গিয়েছিল। জানি এই মনোভাব ভুল। আমি পার্টির কাজে আরও বেশি মগ্ন থেকে তাকে কাটিয়ে তুলতে চেষ্টা করছি"।

পার্টির হায়দ্রাবাদ শহর কমিটির সম্পাদক কমরেড ভাস্কর রাও মারা যাবার পরও তাঁর এইমতো অবস্থা হয়েছিল। ভাস্কর রাও-র মৃত্যুর সময় আমরা ছিলাম চীনে। ফিরে এসে এই দুঃসংবাদ পেলাম। সাথে সাথেই আমি হায়দ্রাবাদ চলে গেলাম। কেন্দ্রীয় কমিটির সভা শেষ করে পি এস সেখানে এলেন। ভাস্কর রাও পরিবারের লোকেদের সাথে কথা বলার সময় তাঁরা একটা কাগজ পি এস - কে দেখালেন যাতে ভাস্কর রাও তাঁর সম্পত্তি ও দায় সম্বন্ধে লিখেছেন, একটি কালো কোট (তিনি উকিল ছিলেন) আর

একজোড়া ছেঁড়া চপ্পল ছাড়া নিজের বলতে আমার আর কিছুই নেই। তারপর তিনি তাঁর দেনার কথা লিখে রেখেছেন। কিন্তু ওই একটি বাক্য পি এস - কে বিচলিত করেছিল। আমরা যে হোটেলে থাকতাম সেখানে ফিরে এসে আমার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি ভাস্কর রাওয়ের লেখা ওই বাক্যটির কথা বলে শিশুর মতো কান্নায় ভেঙে পড়লেন। তেলেঙ্গানা সংগ্রামের সময় ভাস্কর রাও তাঁর বিধবা মা-র সঙ্গে আমাদের মধ্যে যখন যোগ দিয়েছিলেন তখন সবেমাত্র তিনি ছাত্র। পি এস গোপন অবস্থা থেকে প্রকাশ্যে বেরিয়ে আসা পর্যন্ত তাঁরা উভয়েই গুপ্ত কেন্দ্রের পরিচালক হিসেবে কাজ করে গেছেন। পরে পি এস-ই তাঁকে শিখিয়েছিলেন, কেমন করে সাংগঠনিক কাজকর্ম করতে হয়।

ভাস্কর রাও মারা যাবার অল্প দিনের মধ্যেই নির্বাচনের সময় খাম্মাম জেলার আর এক সংগঠক সাচ্চা কমরেড আকস্মিকভাবে মারা যান। গত কেন্দ্রীয় কমিটির সভার পরই খবর এলো নেল্লোর শহরের এক গুরুত্বপূর্ণ কমরেডকে নকশালপন্থীরা কুপিয়ে হত্যা করেছে। পরপর এই মৃত্যুজনিত ঘটনা তাঁর স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব ফেলেছিল, তাঁর মনকেও কিছুটা ভেঙে দিয়েছিল।

আগেই বলেছি, পি এস - এর কষ্ট সহ্য করার ছিল অসীম ক্ষমতা। তিনি ১৯৮৪ সালে যখন মাদ্রাজের হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন তার পরীক্ষা আমি পেয়েছি। মূত্রাশয়ের দারুণ যন্ত্রণায় তিনি কষ্ট পাচ্ছিলেন। ডাক্তাররা এর কারণ খুঁজে বার করতে সিসটোস্কোপি করার সিদ্ধান্ত নিলেন। এটা হলো এক ধরনের অপারেশনের কাজ। পি এস অত্যন্ত দুর্বল ছিলেন বলে ডাক্তাররা সিদ্ধান্ত নিলেন, তাঁকে সংজ্ঞাহীন না করেই এই কাজ করতে হবে। অপারেশন সম্পন্ন করতে এক ঘন্টার বেশি সময় লাগল। তারপর তাঁকে ঘরে নিয়ে আসা হলো। তাঁর সেই চেহারা দেখে সহ্য করতে না পেরে কান্নায় আমি ভেঙে পড়লাম। অপারেশন করেছিলেন যে ডাক্তাররা আমাদের সেই নেল্লোরের ডাক্তারদের একজন বলেছিলেন, পি এস-এর

জায়গায় অন্য কোনো রোগী হলে যন্ত্রণায় আর্ত চিৎকার করতো। অথচ পি এস তখন একটি শব্দও উচ্চারণ করেননি।

১৯৮৫ সালের মে মাসে আমাদের এক বন্ধুর সঙ্গে আমরা থাকতাম। পি এস-এর ডায়ালিসিস চলছে। স্বাস্থ্যর এমন অবস্থা যে তাঁর সমস্ত ব্যাপারেই আমাকে সাহায্য করতে হতো। এই অবস্থাতেও যখনি তাঁর স্বাস্থ্যের কিছুটা উন্নতি হয়েছে, তিনি আমার সাহায্য নিতে না চেয়ে বলতেন,— " আমাকে স্বনির্ভর হতে দাও"।

পার্টি কর্মীদের প্রতি, এমন কি সাধারণ মানুষের জন্য তাঁর আগ্রহ এমনি ছিল যে, ১৮ই মে তাঁর জীবনের শেষ দিনটিতে তাঁর ডায়ালিসিস চলাকালেও তিনি নেল্লোর হাসপাতালের প্রধান ডা: সেশা রেড্ডিকে বলেছিলেন, মাদ্রাজের এক ডাক্তার, যাকে ডা: রেড্ডি জানেন, তিনি নেল্লোরের এক গরিব রোগীর কাছ থেকে অতিরিক্ত টাকা আদায়ের চেষ্টা করছেন। সেই ডাক্তার প্রথমে কিছু টাকার কথা বলে পরে আবার অনেক বেশি টাকা চেয়েছেন। তিনি যে অর্থের কথা বলেছিলেন, ভাল হয়ে ওঠার আশায় রোগীটি তার ছোট্ট জমিটি বিক্রি করে তা নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু যখন তার কাছে আরও বেশি টাকা চাওয়া হলো তার ভগ্ন হৃদয় বাড়ি ফিরে যাওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। কেননা বিক্রি করে টাকা জোগাড় করার মতো তার আর কোনো সামর্থ্যই নেই। এখন তাকে বিনা চিকিৎসায় মরতে হবে। এ কথা বলে পি এস ডা: সেশা রেড্ডিকে বলেছিলেন, এইভাবে সেই ডাক্তার গরিব মানুষটির কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায় যাতে না করেন তিনি যেন তা বলে দেন। এটাই ছিল তাঁর শেষ কথাবার্তা। তাঁরপরই তাঁর রক্তক্ষরণ শুরু হয় এবং জীবনদীপ নির্বাপিত হয়।

আর এক ঘটনার কথা বলি। সাধারণ মানুষের প্রতি ভালবাসার আর এক দৃষ্টান্ত। এক ফল বিক্রেতা রোজই আমাদের গলিতে ফল বিক্রি করতে আসতেন। আমার সঙ্গে কথা বলে তিনি জানতে পারেন, এখানেই পি এস

থাকেন। পার্টির প্রতি তাঁর ছিল দৃঢ় আনুগত্য। দেখা যেতো রোজই তিনি পার্টি অফিসে গিয়ে আমাদের দৈনিক কাগজ খুঁটিয়ে পড়ে তারপর বাড়ি ফিরতেন। পরে একথা আমি জানতে পেরেছিলাম একদিন এই ফল বিক্রেতা তাঁর কিছু সংশয় দূর করার জন্য পি এস - কে কিছু প্রশ্ন করতে চান। সেই মতো একদিন পি এস তাঁর সাথে প্রায় আধঘণ্টা বসে সবকিছু ব্যাখ্যা করে দিলেন। এই বৃদ্ধ মানুষটির প্রশ্নগুলিও ছিল খুবই স্বাভাবিক, যেমন সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে আমরা সমাজতন্ত্র আনতে পারি কি না, সি পি আই ও অন্যান্য তথাকথিত বামপন্থী পার্টিগুলির ভূমিকা, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে চীন ও রাশিয়ায় সম্পর্ক ইত্যাদি। পি এস-এর সঙ্গে আলোচনা করে সেই বৃদ্ধ মানুষটি খুব সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে উৎসাহিত করার জন্য পি এস-এর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে গিয়েছিলেন। এই ছিলেন পি এস, এমন এক মহান মানুষ!

১৯৬৮ সালে হায়দ্রাবাদ থাকার সময় কলকাতা থেকে তিনি আমায় লিখেছিলেন :—

" তোমার চিঠি পড়ে আমি খুশি। আর যাই হোক, তুমি আর আমি, আমরা দু'জনেই মনে করি আমরা আমাদের জীবনের অপচয় করি নি। আমরা দু'জনেই এতগুলি বছর ধরে জনগণের স্বার্থে অবিচলিত থেকে উভয়ের বোঝাবুঝির মধ্যে নিজেদের জীবন কাটাতে চেষ্টা করেছি। এর অতিরিক্ত আর কি আমাদের চাওয়ার আছে!

" আমাদের দাম্পত্য জীবনের ২৫ বছর পার হয়ে গেছে। আমার রাজনৈতিক জীবনের ৪০ বছর কেটেছে যার ৩৮ বছর আমি একজন সর্বক্ষণের কমিউনিস্ট। আশা করি আরও ১০/১২ বছর অন্তত পার্টির জন্য প্রয়োজনীয় কাজকর্ম করে যেতে পারব।"

৪২ বছর ঘনিষ্ঠভাবে থাকার পর তিনি আমাকে ছেড়ে গেলেন। আমি আজ একা, এ কথা বলব না। আমার সাথে আছেন আমাদের পার্টি ও

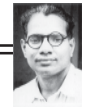

জনগণ। সেই আত্মবিশ্বাস নিয়েই তাঁর চিতার সামনে আমি শপথ নিয়েছি, এই মহান কমিউনিস্ট তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যেপথে এগিয়েছেন, সেই বিপ্লবী পথ থেকে আমি কখনও সরে আসব না। সরে আসতে পারি না।

[সৌজন্যে : দেশহিতৈষী শারদ সংখ্যা]

ফিরে দেখা ঃ কর্মীদের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ

পি. সুন্দরাইয়া

আমাদের এই সংগ্রাম একমাত্র তখনই জারি রাখা যাবে যখন আমাদের আন্দোলন আরও শক্তিশালী হয় এবং রাজনৈতিক পদক্ষেপ অধিকতর বিস্তৃত হয়। অধিকন্তু, কর্মীদের শিক্ষাগত মান অনেক-অনেকগুণ বাড়াতে হবে। কয়েকজন ব্যক্তি বিপ্লব করে ফেলতে পারে কিংবা সংসদীয় কিছু বিজয়ের ঘটনা আমাদের সেই লক্ষ্যে নিয়ে যাবে— এ ধরনের সোজা- সরল চিন্তা নিতান্তই ভুল। জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার সাধারণ উন্নতি ঘটতে হবে। সে জন্য আমাদের নিরন্তর চেষ্টা চালাতে হবে। এবং ধৈর্য সহকারে পরিণত পরিস্থিতির জন্য অপেক্ষা করতে হবে। সুতরাং পার্টির দলিলে বিপ্লবের যথেষ্ট সম্ভাবনার কথা যখন লেখা হলো তখন আমি তাতে আপত্তি জানিয়েছিলাম। আমি তাঁদের বললাম যে, গত ৫০ বছর ধরেই আমরা এই সম্ভাবনার কথা ও তার সুযোগ গ্রহণে আমাদের ব্যর্থতার কথা বলে আসছি। কিন্তু বাস্তবে তো কিছুই হলো না। বললাম, তা হলে এই সম্ভাবনার কথা বলে লাভ কী? আমাদের বাস্তব অবস্থা বোঝা উচিত। আমি ব্যক্তিগতভাবে এ ধরনের অনুমাননির্ভর বক্তব্য পছন্দ করতাম না।

আমি যখন পার্টির সাধারণ সম্পাদক, বাঙলা কমিটিতে তখন চীনমুখী প্রবণতা মাথাচাড়া দিচ্ছিল। প্রমোদ দাশগুপ্ত সমস্যাটির মোকাবেলা করছিলেন এবং তাদের সঙ্গে তিনি আলোচনা করতেন। আমরা তখন উদার নির্দেশিকা দিতাম।

এই উদার নির্দেশিকাগুলোকে তালিকাভুক্ত করে রাজ্য কমিটির মাধ্যমে রূপায়িত করার জন্য আমি সচেষ্ট ছিলাম। রাজ্য কমিটিগুলোকে বোঝাতে আমি যথাসম্ভব চেষ্টা করেছি এবং এসব নির্দেশিকা পালন করবে কি করবে না এটা তাদের ওপর ছেড়ে দিয়েছি। আপনি পেছন দিকে যেতে পারেন না

এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্তসমূহ পালনের জন্য আপনার উদ্যোগ থাকতে হবে। কর্মীকে না জেনে এবং বাস্তব পরিস্থিতি অনুধাবন না করে সামনে এগোনো ও নির্দেশ দেয়ার চেষ্টায় কাজের কাজ কিছুই হয় না। একবার যখন কেন্দ্রীয় কমিটির কোনও বিষয়ে উদার নির্দেশিকা রাজ্য কমিটিগুলিকেই বাস্তবায়িত করতে হয়। আপনি কোনওভাবেই রাজ্য কমিটিকে টপকে গিয়ে আপনার সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতে পারেন না। রাজ্য কমিটির সদস্যদের যদি বিশ্বাস জন্মানো না যায়, তা হলে তাদের মধ্যে বিশ্বাস তৈরি করতে হবে। তা না হলে আপনি কী করবেন? তখন বিষয়টির সেখানেই ইতি টানতে হবে।

পার্টিতে একটা সাধারণ ধারণা তৈরি হয়েছিলো যে বাঙলার পরিস্থিতি ও পার্টি সংগঠন সম্পর্কে জ্যোতি বসু ও প্রমোদ দাশগুপ্ত, যাঁরা বাঙলা থেকে পলিটব্যুরোতে ছিলেন, তাঁদের কথা বাদ দিলে আমি বেশি জানি। কিন্তু, এ কথা আমি সমর্থন করি না। অবশ্য, কেন্দ্রীয় কমিটির নেতা হিসেবে আমরা বিভিন্ন রাজ্যের পার্টি সভায় উপস্থিত থাকতাম। কখনও কখনও স্থানীয় কর্মীদের সঙ্গে মত বিনিময় করতাম। বাঙলার রাজ্য নেতৃত্বের চেয়েও আমি বাঙলাকে বেশি চিনি এ কথাটি সম্পূর্ণ ভুল। তবে হ্যাঁ, ওই রাজ্যের ছাত্রযুব নেতৃত্বের সঙ্গে আমার প্রায়শই দেখা হতো। সুতরাং, ওদের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিলো। পার্টির সম্পাদক হিসেবে তখন আমি ছাত্র-যুব ফ্রন্ট দেখার দায়িত্বে ছিলাম। তারা তাদের যাবতীয় সমস্যা নিয়ে আমার কাছে আসত এবং কীভাবে আন্দোলন ও অন্যান্য কর্মসূচী রূপায়িত করা যায়, সে সম্পর্কে পরামর্শ চাইতো। এমনকি কখনও কখনও সহজ কিংবা তুচ্ছ অভিযোগ নিয়েও আমার সঙ্গে দেখা করতো। কিন্তু, নেতা হিসেবে আপনাকে ধৈর্যের সঙ্গে তাদের সঙ্গে আচরণ করতে হবে। ওদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামতের সঙ্গে আপনার সহমত পোষণের মনোভাব দেখানো উচিত। কখনও কখনও আমি মেজাজ হারিয়ে ফেলতাম। চিৎকার করে ওদের চলে যেতে বলতাম। ওদের খোলা মনে ও সত্য গোপন না করে আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতাম। তাতে কেউ কেউ নিরুৎসাহিত হয়ে সরে পড়তো।

তবে, আমি সর্বদা ধৈর্য ও মনোযোগের সঙ্গে পার্টি কর্মীদের সমস্যাগুলো শোনার চেষ্টা করতাম। সমস্যা শারীরিক হোক কিংবা সাংগঠনিক সবই আমি শুনতাম। সব বিষয়েই তাদের সাহায্য করার চেষ্টা করতাম। প্রবীণ নেতৃত্ব হিসেবে তাদের মনের অবস্থা আমাদের বোঝার চেষ্টা করতে হবে এবং আশু সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের পরামর্শ দিতে হবে। যেহেতু আমি খুবই মনোযোগের সঙ্গে কর্মীদের কথা শুনতাম ও তাদের সমস্যার প্রতি সহমর্মিতা দেখাতাম, হয়তো সে কারণেই বাঙলার যুব বয়সী কমরেডরা আমরা প্রশংসায় মুখর ছিলেন।

আরেকটি বিষয় হচ্ছে, আমি নিয়মিত পড়াশুনো করতাম এবং জনসভায় কিংবা পার্টিসভ্যদের সাধারণ সভায় বক্তৃতা করার আগে বিষয়বস্তুটিকে ব্যাপকভাবে বিশ্লেষণ করতাম। সাংবাদিক সম্মেলনের বেলায়ও এটাই করতাম। নেতাদের শুধুমাত্র জনসভায় বক্তৃতা দেয়ার মধ্যে নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। স্থানীয় পার্টি কর্মীদের সঙ্গে দেখা করা এবং তাদের সমস্যা বিশেষ করে সংগঠনিক সমাধানে পরামর্শ দেওয়ার জন্য নেতাদের সময় বের করা উচিত। নেতাদের স্থানীয় স্তরে পার্টি কর্মসূচী রূপায়ণে সাহায্য করা ও পর্যালোচনায় অংশ নিতে হবে। জনসভায় বক্তৃতা দেওয়ার চাইতে পার্টিসভ্যদের সাধারণ সভায় বক্তব্য রাখার কাজে বেশি সময় ব্যয় করতে আমি পছন্দ করতাম। এই সভাগুলিতে স্থানীয় নেতৃত্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে আমাদের প্রত্যক্ষ মত বিনিময়ের সুযোগ হতো এবং এর মাধ্যমে আমরা তাদের অভিজ্ঞতা ও সমস্যার অংশীদার হতে পারতাম। যদিও তারা যেসব সমস্যা উত্থাপন করবে, নেতাদের জন্য সেগুলো নিতান্তই ছোট মনে হতে পারে। কিন্তু সেগুলোই কর্মীদের প্রভাবিত করতে পারে।

প্রচুর পড়াশুনার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন রাজ্য সম্পর্কে আমার একটা সাধারণ ধারণা তৈরি হতে পেরেছিল। অধিকাংশ রাজ্যের ভৌগোলিক অবস্থা সম্পর্কে অনেকের চেয়ে আমার জ্ঞান বেশি বিস্তৃত ছিল। অবশ্য, ওইসব রাজ্য থেকে আসা পলিটব্যুরো ও কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্যরা তাঁদের রাজ্যের ভৌগোলিক অবস্থা সম্পর্কে আমার চেয়েও স্বাভাবিকভাবেই বেশি অবগত ছিলেন।

আমার কাছে এটা কোনও বড় বিষয় ছিলো না। পার্টির সাধারণ সম্পাদক হিসেবে প্রায়শই বিভিন্ন রাজ্যে যেতাম। এতটুকুনই। কেউ কেউ বলতেন আমি নাকি ত্রিভাঙ্কুরের প্রতিটি প্রান্ত সম্পর্কে রাজ্য নেতাদের চেয়েও বেশি জানি। এটাও সঠিক নয়। যেমনটা আগে বলেছি, আমার হাঁটার অভ্যেস ছিলো এবং এটাই আমাকে যে শহরে গিয়ে আমি থাকতাম, সেই শহর সম্পর্কে অন্তত একটা ধারণা তৈরি করতে সাহায্য করতো। এমনকি দিল্লিতেও আমি অলিগলি চষে বেড়াতাম। সুতরাং, আমি কখনোই মনে করতাম না যে ত্রিভাঙ্কুর অথবা অন্য কোনও শহর সম্পর্কে আমি কোনও বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী।

সংগঠনের উন্নয়ন সম্পর্কে পার্টির সাধারণ সম্পাদক হিসেবে আমার অবদানের কথা বলতে গেলে আমার মনে হয় আমি কাজটা ভালোভাবেই করেছি। শেষ পর্যন্ত পার্টি ও ইতিহাসই আমার ভূমিকা বিবেচনা করবে। এক দশক বা তারও একটু বেশি হলে হতে পারে, আমি যখন পার্টির সাধারণ সম্পাদক ছিলাম, সে সময় বিভিন্ন রাজ্যে ও জাতীয় স্তরে বেশ কিছু গণআন্দোলন সংঘটিত হয়েছে। এগুলোর প্রভাব পার্টিতে পড়েছে। এসব ঘটনাবলীতে আমারও কিছু ভূমিকা ছিল বই কী। হতে পারে কোথাও চোখে পড়ার মতো, আবার কোথাও বা একেবারেই ছোট দরের। কোন ইস্যুগুলি নিয়ে কী ধরনের সংগ্রাম আমার নেতৃত্বে পরিচালিত পার্টি সংগঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলো এবং কোন সব নীতি গৃহীত হয়েছিলো, সেগুলির রূপায়ণে আমার ভূমিকাই বা কী ছিলো— এ জাতীয় সম্যক বিষয়ের বিশ্লেষণ করতে হবে। এখন আমি সে সব বিষয় বিস্তৃত বলছি না। সে যাই হোক, আমার মনে হয়, বিগত পাঁচ দশক ধরে দেশে বাম আন্দোলন শক্তিশালী করার যে প্রয়াস চালিয়েছি, তাতে ফল মিলেছে এবং আমি তার জন্য গর্ববোধ করি। অন্যান্য বিষয়ে পার্টিকেই মূল্যায়ন করতে হবে।

১৯৭৫-৭৬ সাল থেকে পরবর্তী বছরগুলোতে পার্টির অভ্যন্তরে গোলযোগ চলছিলো। অভ্যন্তরীণ আলোচনা, বিভিন্ন ইস্যুতে মতভেদ এবং সে সব বিষয়ে আমার দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি যাবতীয় রেকর্ড পার্টির খাতাপত্রে

রয়েছে। শুরু থেকে আমি পার্টির বিভিন্ন স্তরে কাজ করেছি, কাজ করেছি বিভিন্ন পদে থেকে। অন্য কমরেডরাও তাই করেছেন। এঁরা অনেকেই মারা গেছেন, কেউ কেউ রয়েছেন সি পি আই-তে তাঁরা সবাই অত্যন্ত ভালো ভূমিকা পালন করেছেন। বাম আন্দেলনের শুরুর দিন থেকে সক্রিয় থাকা নেতাদের একটি তালিকা আমি করেছি। তাঁদের আমি প্রশংসা ও শ্রদ্ধা করি। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ সি পি আই করেন, কেউ বা প্রয়াত হয়েছেন। আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁদের ভূমিকা বাস্তব অবস্থার নিরিখে বিচার করতে হবে। আমি মনে করি, তাঁদের ঐতিহাসিক ভূমিকার মূল্যায়ন করতে গিয়ে তাঁদের ব্যক্তিত্ব, কঠোর পরিশ্রম ও অবদানের উপর সর্বশেষ গুরুত্ব আরোপ করা উচিত।

আমার রাজনৈতিক জীবন ৫৫ থেকে ৬০ বছর হবে। অনেক দৃঢ়প্রত্যয়ী কমরেডের সঙ্গে আমার কাজ করার সুযোগ হয়েছে। সেইসব মুহূর্তগুলো স্মরণ করতে গেলে আমাকে আগেকার অনেক দলিল পড়তে হবে। দেখা যাক, সেটা আমি করতে পারি কী না।

(নিবন্ধটি পি সুন্দরাইয়ার আত্মজীবনী গ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে)